# সদাশিবের তিনকাণ্ড

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৬

এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক :

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট :

অজিত গুপ্ত

মুদ্রক :

রণজিৎকুমার দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

এক টাকা পঁচাত্তর নয়াপয়সা

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীরাজশেখর বসু

পরশুরামেষু—

**SADASHIBER TEENKANDO**

*A Novel*

*by*

**Saradindu Bandopadhyaya**

Re. 1-75 nP.

# সদাশিবের আদিকাণ্ড

॥ এক ॥

সদাশিব গাঁয়ে টিকতে পারল না। একে তো সে বাপ-মা মরা ছেলে, মামার বাড়িতে মানুষ; তার ওপর গাঁ-সুদ্ধ লোক তার ওপর চটা। সবাই বলে—'আমরা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেলাম, আর তোর এমন তেল চিক্‌চিকে চেহারা হল কি করে? নিশ্চয় আমাদের খাবার চুরি করে খাস!'

সদাশিব কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—'কক্ষনো না। কার চুরি করে খেয়েছি তোমরাই বল।'

তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না, কিন্তু শাসিয়ে দেয়—'যেদিন ধরব সেদিন হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।'

সত্যিই গ্রামের অবস্থা ভারি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রান্তে পশ্চিমঘাটের খাঁজের মধ্যে ছোট্ট গ্রামটি এতদিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল, কিন্তু কয়েক বছর থেকে এমন উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যে বলবার কথা নয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বেধেছে। উত্তর থেকে মোগলেরা এসে দৌলতাবাদ মহলে বসেছে, আর দক্ষিণে আছে আদিলশাহী বিজাপুর রাজ্য। দুই পক্ষে ঠোকাঠুকি লেগেছে। যুদ্ধ তো চলছেই, তার ওপর দুই পক্ষের সিপাহীরা সুবিধা পেলেই গ্রাম লুঠ করছে। গ্রামবাসী চাষারা সারা বছর পরিশ্রম করে যা দু'চার দানা জোয়ার-বাজ্‌রি তুলছে তা গ্রামবাসিদের পেটে যাচ্ছে না, বেশির ভাগই সিপাহীরা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু-খাগ্‌ড়ার প্রাণ যায়, গ্রামের অবস্থা হয়েছে তাই। আধ-পেটা খেয়ে গ্রামের লোক কোনও রকমে বেঁচে আছে।

উপরন্তু সম্প্রতি আর এক উপসর্গ হয়েছে। শিবাজী নামে এক মারাঠা যুবক একদল ডাকাত যোগাড় করে চারিদিকে লুঠ-তরাজ করে বেড়াচ্ছে। গরীব চাষাদের ওপর সে হানা দেয় না, তার নজর রাজা-বাদশার ওপর। ভারি ডাকা-বুকো লোক, কাউকে ভয় করে না। লোকে বলে শিবাজী নাকি মোগলদের তাড়িয়ে আর বিজাপুরী মুসলমানদের দমন করে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তা কি পারবে শিবাজী? মোগলদের তাড়ানো কি সামান্য ডাকাতের কাজ? মাঝ থেকে দেশের লোকের দুর্দশা বেড়েই যাচ্ছে। কারুর ঘরে অন্ন নেই, সকলের চেহারা কঙ্কালসার।

কেবল সদাশিবের চেহারা ওরি মধ্যে একটু শাঁসে-জলে। তার বয়স সতেরো কি আঠারো বছর, বেঁটে-খাটো কর্মঠ দেহ, চিকণ শ্যাম গায়ের বর্ণ, মুখখানি ভালমানুষের মত। আচার আচরণও শান্ত শিষ্ট। কিন্তু গাঁয়ের সবাই তার শত্রু। সবাই ভাবে—ছোঁড়া কোথা থেকে বেশি খাবার পায়? তার মামা সখারাম কিপ্টে মানুষ, সে নিজে না খেয়ে ভাগ্নেকে বেশি খেতে দেবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সদাশিবের ওপর নজর রাখে,

কিন্তু কেউ কিছু ধরতে পারে না। তাদের খালি রাগ হয়। তারা জানে না যে গ্রামে সদাশিবের একটি বন্ধু আছে যে নিজে সিকি-পেটা খেয়ে নিজের খাবারের ভাগ সদাশিবকে দেয়। গাঁয়ে কেবল ওই একটি মানুষ সদাশিবকে ভালবাসে।

একদিন গ্রীষ্মের বিকেলবেলা সদাশিবের মামা সখারাম বললেন,—'বাবা সদাশিব, তোমাকে আর আমি খেতে দিতে পারছি না, এবার তুমি নিজের রাস্তা দেখ।'

গাঁয়ের বারোয়ারি বটতলায় পাঁচজন মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনেই সখারাম কথাটা তুললেন, বোধহয় মাতব্বরদের সঙ্গে আগেই সলা-পরমর্শ করে রেখেছিলেন।

সদাশিব হাঁ করে মামার মুখের পানে চেয়ে রইল, শেষে বলল,—'তুমি খেতে না দিলে আমি খাব কি?'

গাঁয়ের বুড়ো বিঠ্ঠল পাটিল বললেন,—'তুমি জোয়ান হয়েছ, নিজে পরিশ্রম করে রোজগার করে খাবে। মামা তোমাকে কতদিন খাওয়াবে?'

সদাশিব বলল,—'আমি পরিশ্রম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তোমরা আমায় কাজ দাও।'

একজন মোড়ল হাত উল্টে বললেন,—'কাজ কোথায়? দেখছ না আমরা সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছি। কার জন্যে চাষবাস করব? সিপাহিদের জন্যে?'

সদাশিব বলল,—'তবে আমি কি করব বলে দাও।'

বিঠ্ঠল পাটিল খিঁচিয়ে উঠলেন,—'তা আমরা কি জানি? তোমাকে গাঁয়ের কেউ চায় না। তুমি কালই যেখানে ইচ্ছে চলে যাও।'

সদাশিব ছলছল্ চোখে সকলের পানে তাকাতে লাগল। বলল,—'কোথায় যাব? আমি যে কখনো গাঁয়ের বাইরে যাইনি।'

একজন মাতব্বর বললেন,—'যাবার ভাবনা কি? মোগলদের দলে ভিড়ে পড় গিয়ে। তুমি তো আমাদের মত রোগা পটকা নয়, বেশ মোটা-তাজা আছ। মোগলেরা লুফে নেবে।'

আর একজন বললেন,—'বিজাপুরীদের দলেও যোগ দিতে পার।'

তৃতীয় মাতব্বর রসিকতা করে বললেন,—'সবচেয়ে ভাল,

তুমি শিবাজীর ডাকাতের দলে জুটে যাও। তোমার চুরি করা অভ্যেস আছে। ডাকাতের দলে খুব কদর হবে।'

সদাশিব আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে নদীর কিনারে বসল। গ্রামের প্রান্তে ছোট্ট পাহাড়ী নদী, গ্রীষ্মের তাপে প্রায় শুকিয়ে এসেছে; তীরে ঝোপঝাড় জঙ্গল। একটা পনস গাছ নিঃঝুমভাবে দাঁড়িয়ে আছে; গাছে একটিও ফল নেই, ইঁচড় অবস্থাতেই গাঁয়ের লোক পেড়ে নিয়ে গেছে। সদাশিব তার একটা নীচু ডালে উঠে বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ভাবতে লাগল।

সদাশিব অনেকক্ষণ বসে ভাবল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পেল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সদাশিব তখন ডাল থেকে নেমে নদীর তীর থেকে দুটি নুড়ি কুড়িয়ে আনল, নুড়ি দুটি পনস গাছের ডালের ওপর রেখে গাঁয়ে ফিরে চলল। দুটি নুড়ির সঙ্কেত কেবল একজন বুঝবে—দুই পহর রাতে এখানে এসো, দেখা হবে।

ফিরে যেতে যেতে সদাশিব দেখল গাঁয়ের ঝি-বৌরা নদীতে জল নিতে আসছে। সে তাদের এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

পাহাড়ের উপত্যকায় রাত্রি আসে তাড়াতাড়ি। সদাশিব ফিরে এসে মামীর দেওয়া আধখানা শুকনো বাজরির রুটি খেয়ে বাইরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল রাত দুপুরে। পুব আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠি উঠি করছে। সদাশিব নিঃশব্দে উঠে ছায়ার মত নদীর পানে চলল। পনস গাছের তলায় অন্ধকার; কিন্তু সদাশিব অন্ধকারে দেখতে পায়। সে দেখল গাছের নীচু ডালে ঠেস দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ের মোড়ল বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ে কুঙ্কুম।

সদাশিব তার পাশে গিয়ে গাছের ডালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কুঙ্কুমের বয়স যদিও তের চৌদ্দ বছর, তাকে দেখলে মনে হয় নয়-দশ বছরের মেয়ে। ছোটখাটো শরীরটিতে কিন্তু বেশ সৌষ্ঠব আছে। বেশি কথা কয় না, কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী। এতটুকু মেয়ের যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

ফিস্‌ফিস্ করে কথা হল। সদাশিব বলল,—'কুঙ্কু, সব খবর জানিস তো?'

কুঙ্কু বলল,—'জানি।—এই নাও, খাও।' বলে হাতের খাবার সদাশিবের মুখের কাছে ধরল। সদাশিব খাবারে কামড় দিয়ে দেখল—পূরণপুরী! অনেকদিন সে পূরণপুরী খায়নি, মনের সুখে চিবতে চিবতে বলল,—'এবার আমি চলে যাব, তুই পেট ভরে খেতে পাবি। সিকি-পেটা খেয়ে খেয়ে তোর বাড়-বৃদ্ধি কমে গেছে।'

কুঙ্কু বলল,—'আহা, ভারি জানো তুমি। সিকি টুকরো রুটি খেয়েই আমার পেট ভরে যায়, বাকি রুটি কি ফেলে দেব? তাই তোমার জন্যে রেখে দিই।'

এতক্ষণে চাঁদ একটু উঁচুতে উঠেছে, গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না তাদের মুখে পড়েছে। সদাশিব বলল,—'আমি চলে গেলে কি করবি?'

কুঙ্কু একথার জবাব দিল না, বলল,—'সকালেই চলে যাবে?'

সদাশিব বলল,—'হাঁ। তোর বাবা গাঁয়ের পাটিল, সে চলে যেতে বলেছে। যদি না যাই, মেরে তাড়াবে। ভাবছি সকাল হবার আগেই চলে যাব।'

কুঙ্কু বলল,—'কোথায় যাবে?'

সদাশিব কিছুক্ষণ পূরণপুরী চিবিয়ে বলল,—'তা জানি না। কেউ বলে মোগলের দলে যাও, কেউ বলে বিজাপুরীদের দলে যাও। তুই কি বলিস?'

কুঙ্কু বলল,—'আমি বলি তুমি পুণায় যাও, শিবাজীর দলে যোগ দাও। শিবাজীকে লোকে ডাকাত বলে, কিন্তু তিনি সত্যি ডাকাত নয়। তিনি বিদেশী শত্রুদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে লড়ছেন। তিনি যখন রাজা হয়ে বসবেন তখন দেশে সুখ শান্তি ফিরে আসবে।'

সদাশিব উৎসাহ ভরে বলল,—'তুই ঠিক বলেছিস কুঙ্কু, আমি শিবাজীর দলে যোগ দেব। মোগল আর বিজাপুরীদের জ্বালায় পেট ভরে খেতে পাই না, ওদের দেশ থেকে তাড়াব।'

পূরণপুরী খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুঙ্কু সদাশিবের হাতে একটা থলি দিয়ে বলল,—'এটা নাও, পথে কাজে লাগবে।'

থলিতে কি আছে সদাশিব জিজ্ঞাসা করল না, থলিটা কাঁধে ফেলল; কুঙ্কুর কাঁধে হাত রেখে বলল,—'কুঙ্কু, এবার তবে যাই। আবার দেখা হবে।'

কুঙ্কু বলল, --'এস। আবার দেখা হবে।'

কুঙ্কু দাঁড়িয়ে রইল, সদাশিব বেরিয়ে পড়ল। সে আর ঘরে ফিরে যাবে না, সিধা পুণার দিকে যাত্রা করবে। আকাশে চাঁদ আছে, এই বেলা বেরিয়ে পড়াই ভাল। কিন্তু পুণার দিকে যেতে হলে গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সদাশিব গ্রামের ভিতর দিয়ে চলল। মরা জ্যোৎস্নায় অসাড় গ্রামটিও যেন মরে গেছে। সদাশিব একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

কুঙ্কুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সদাশিব দেখল, বিঠ্ঠল পাটিলের ঘোড়াটা বাড়ির সামনের মাঠে বাঁধা রয়েছে। ঘোড়াটার চেহারা দেখে দুঃখ হয়, হাড় জির্‌জির্ করছে। যে-গাঁয়ে মানুষই পেট ভরে খেতে পায় না, সে-গাঁয়ে ঘোড়াকে কে খেতে দেবে? গ্রীষ্মকালে বনের ঘাসও শুকিয়ে গেছে।

ঘোড়াটার পানে চেয়ে চেয়ে সদাশিবের মনে ভারি কষ্ট হল। আহা! ঘোড়াটা বোধ হয় বাঁচবে না, না খেতে পেয়ে মরে যাবে। এমন একটা জন্তু না খেয়ে মরে যাবে? তার চেয়ে---

সদাশিব একবার সতর্কভাবে চারিদিকে তাকাল। নিঃশব্দ নিশুতি গ্রাম, কোথাও সাড়া নেই। সে পা টিপে টিপে ঘোড়ার কাছে গেল, তার গলার রশি খুলে মুখে লাগাম বসালো, তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে গ্রামে বাইরে নিয়ে চলল।

গ্রামের বাইরে গিয়ে সদাশিব ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, তারপর পুণার দিকে মুখ করে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

## ।। দুই ।।

গ্রাম থেকে পুণায় যাবার কোনও সড়ক নেই, পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে যেতে হয়। তবে পুণা শহরটা কোন দিকে তা মোটামুটি সদাশিবের জানা ছিল। সে সেই দিকে চলল।

পাহাড়ের গুহায় জঙ্গলে অনেক হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে; দলবদ্ধ শিয়াল, দলবদ্ধ নেকড়ে, বুনো কুকুর, তরস। তরক্ষু বা হায়েনাকে এদেশে তরস বলে। কিন্তু সদাশিবের বরাত ভাল, সে জন্তু জানোয়ারের পাল্লায় পড়ল না। জানোয়ারেরা বোধহয় অন্য দিকে শিকারে বেরিয়েছে।

ক্রমে সকাল হল; চাঁদ ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে গেল, সূর্য উঠল। পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালেও রাত্রিবেলা ঠাণ্ডা থাকে, দিনে গরম। সূর্য যত উঁচুতে ওঠে গরমও তত বাড়তে থাকে। সদাশিবের ঘোড়াটা অনাহারে শীর্ণ, তবু সে পাহাড়ী ঘোড়া; সদাশিবকে পিঠে নিয়ে পাহাড় ভেঙে চলেছে। কখনও চড়াই কখনও উৎরাই; একের পর এক ঘাট আর উপত্যকা। দেখলে মনে হয় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ হঠাৎ জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে।

কোথাও জনমানব নেই, গ্রামের চিহ্ন নেই। একবার উপত্যকায় নেমে সদাশিব দেখল, ছোট উপত্যকার নামাল্ কোণে ঝর্ণার জল জমেছে, গ্রীষ্মের তাপে একেবারে শুকিয়ে যায়নি। ঘোড়াটাও দেখতে পেয়েছিল, সে বল্গার ইঙ্গিত পাবার আগেই সেই দিকে ছুটল।

ছোট্ট ডোবার মত জলাশয়, তাকে ঘিরে সবুজ ঘাসের পাড়। সদাশিব ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি ভরে জল খেল; ঘোড়াটাও চোঁ চোঁ করে খুব খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে কচি ঘাস খেতে লাগল।

কিছু দূরে একটা পাথরের চাঁই উঁচু হয়ে একটু ছায়া করেছিল, সদাশিব সেই ছায়ায় গিয়ে বসল। কুঙ্কু থলিতে কি দিয়েছে এখনও দেখা হয়নি।

থলিতে বেশি কিছু নেই। কয়েক মুঠো ভুট্টার দানা, মোটা মোটা দুটো বাজরির রুটি, আর একটি বজ্রের মত কঠিন মুগের লাড়ু। সদাশিব খাবার জিনিষগুলি স্নেহভরে নিরীক্ষণ করতে করতে ভাবল—কুঙ্কু যা খাবার দিয়েছে তাতে একদিন কেন, দু'দিন চলে যাবে। সে কল্পনার চক্ষে দেখতে লাগল গ্রামে এতক্ষণ কী হচ্ছে। পাটিলের ঘোড়া অদৃশ্য হওয়ায় নিশ্চয় খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে। সদাশিবের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে এক মুঠি ভুট্টার দানা খেয়ে আবার পেট ভরে জল খেল, তারপর ঘোড়ায় চড়ে আবার চলল। ঘোড়াটাও ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ঘাস খেয়ে নিয়েছে।

দুপুর বেলা সদাশিব এক পাহাড়ের ডগায় উঠে ঘোড়া দাঁড় করালো। চারিদিকে চেয়ে দেখল, সূর্যের খর তাপে আকাশ-বাতাস যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দূরে অনেকগুলো পাহাড়ের

পরপারে একটা দুর্গের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কোন্ দুর্গ বলা যায় না। মহারাষ্ট্র দেশের পাহাড় পর্বতের খাঁজে খাঁজে কত দুর্গ আছে; কোনোটা বিজাপুরীদের দখলে, কোনোটা মোগলদের দখলে, আবার কোনোটা শিবাজী ছলে-বলে দখল করে নিয়েছেন। ওই দুর্গটা কার দখলে তা না জেনে ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাছাড়া ওখানে যেতে হলে কোন্ পথে কত পাহাড় ঘুরে যেতে হবে তা কে জানে। তার চেয়ে নাকের সোজা চলাই ভাল।

সারাদিন সদাশিব চলল। ক্ষিদে পেলে ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই কিছু খেয়ে নিল। অবশেষে সূর্য যখন পাটে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় সে একটা নতুন উপত্যকায় পৌঁছল। বেশ বড় উপত্যকা, অনেক গাছপালা; মাঝখান দিয়ে একটি সরু নদী বয়ে গেছে। সদাশিব ভাবল, পুণার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, হয়তো মানুষের দেখা পাব। তা যদি নাও পাই, এখানে রাত কাটানো শক্ত হবে না। অনেক বড় বড় গাছ আছে।

উপত্যকায় নেমে এসে সদাশিব কিন্তু জনমানুষ দেখতে পেল না। আগে এখানে গ্রাম ছিল, এখনও নদীর পাড়ে ছাইয়ের একটা চক্র তারই সাক্ষী দিচ্ছে; গ্রামবাসীরা শত্রুর আক্রমণে মরেছে, যারা পেরেছে পালিয়েছে। শত্রু গ্রাম লুঠ করে ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেছে।

নদীর পাড় থেকে জলের ধারে গিয়ে সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়ার লাগাম খুলে সামনের পা ছেঁদে দিয়ে ছেড়ে দিল। নদীর ধারে কচি ঘাস আছে; ঘোড়া তাই খাবে কিন্তু বেশি দূরে পালাতে পারবে না।

তারপর সে জলের ধারে পাথরের ওপর বসে পেট ভরে খাবার খেল; থলি প্রায় খালি হয়ে গেল। শুধু মুগের লাড়ুটা সে কালকের জন্য রেখে দিল। কাল লোকালয়ে পৌঁছতে পারবে কিনা বলা যায় না। কিছু রসদ থাকা ভাল।

খাওয়া শেষ করে সদাশিব গাছ খুঁজতে বেরুল। রাত্রে মাটিতে শোয়া চলবে না, নেকড়ে তরস আছে। গাছে উঠে রাত কাটানোই সব চেয়ে নিরাপদ। নদী থেকে খানিকটা দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ রয়েছে, বুনো জাম গাছ। গাছের ডালে ডালে থোকা থোকা কালো ফল ফলেছে, গাছের তলায় ঝরে-পড়া পাকা জাম

বিছিয়ে আছে। সদাশিব দেখল এই গাছটাই উপত্যকার মধ্যে সব চেয়ে বড় গাছ, এত বড় গাছ আর একটাও নেই। সদাশিব আর দ্বিধা করল না, সে গাছে উঠে পড়ল। মাটি থেকে পনরো হাত উঁচুতে একটি জুৎসই ডালে বসে অন্য একটি ডাল ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে চোখ বুঁজল।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সদাশিবের শরীরে সারাদিনের ক্লান্তি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * * *

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মানুষের গলায় আওয়াজ! সদাশিব চোখ খুলে দেখল আকাশে চাঁদ উঠেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, তু'জন লোক গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ চোখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের সাজ-পোষাক সৈনিকের মত, হাতে বল্লম। সদাশিব নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগল তারা নিজেদের মধ্যে কথা কইছে।

একজন বলল,—'এস মিঞা, এই গাছতলায় পোতা যাক।'

সদাশিব নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগল তারা নিজেদের মধ্যে কথা কইছে

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল,—'এই গাছের তলায় কেন? অন্য গাছ কি দোষ করেছে?'

প্রথম ব্যক্তি বলল,—'বুঝলে না, এই গাছটা এখানকার সব চেয়ে বড় গাছ। পরে যখন আমরা মাল উদ্ধার করতে আসব তখন খুঁজে বেড়াতে হবে না। জানা থাকবে যে-গাছটা সব চেয়ে বড় তার তলাতেই মাল পোতা আছে।'

'তা বটে। বেশ, তাহলে এখানেই গর্ত খোঁড়া যাক।'

দু'জনে বল্লমের ফলা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। তারা মারাঠী ভাষায় কথা বলছিল, তাই সদাশিব বুঝল ওরা মোগল নয়, বিজাপুরী দলের মুসলমান সিপাহী। তারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কথাবার্তা বলতে লাগল। পাথুরে মাটি সহজে খোঁড়া যায় না; একজন ক্লান্ত হয় তো অন্য জন খোঁড়ে। সদাশিব গাছের ওপর বসে তাদের কথা শুনতে শুনতে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল।—

বিজাপুরীদের একটা দুর্গ থেকে আর একটা দুর্গে খাজনা যাচ্ছিল। সঙ্গে পঞ্চাশজন রক্ষী ছিল। ডাকাতের ভয়ে দিনের বেলা মাল চালান হয় না, রাত্রে হয়। আজ সন্ধ্যে বেলা এরা দুটো গরুর গাড়িতে মোহর আর টাকা চাপিয়ে দুর্গ থেকে যাত্রা করেছিল, আশা করেছিল ভোর হবার আগেই অন্য দুর্গে পৌঁছে যাবে; দুই দুর্গের মাঝে কেবল দশ-বারো ক্রোশের তফাত। কিন্তু ডাকাতেরা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে এরা পারল না। রক্ষীদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেল, কয়েকজন পালিয়ে গেল। ডাকাতেরা একটা গরুর গাড়ির মাল লুটে নিল।

দ্বিতীয় গরুর গাড়িটাকে তখনও একদল রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। ডাকাতেরা এবার সেটাকে আক্রমণ করল। কিন্তু আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দলের একজন লোক গুরুতর আহত হল, তার ঘোড়াটাও মারা পড়ল। সে বোধ হয় দলের নেতা; ডাকাতেরা তখন আহত নায়ককে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, দ্বিতীয় গরুর গাড়িটা লুঠ করল না।

ডাকাতেরা যখন চলে গেল তখন রক্ষীদের মধ্যে মাত্র এগারো জন লোক আছে। পাঁচ-ছয় জন মরে গেছে, বাকি পালিয়েছে। এই এগারো জন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল—ডাকাতেরা তো একটা গরুর গাড়ি লুটে নিয়ে গেছে, এরা এগারো জন দ্বিতীয় গরুর

গাড়ির মাল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে, তারপর কাল সদরে গিয়ে বলবে, দুটো গরুর গাড়িই লুট হয়ে গেছে। কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।

দ্বিতীয় গরুর গাড়িতে কেবল মোহর ছিল; এগারোজন নিজেদের মধ্যে মোহর সমান ভাগ করে নিয়ে যার যেদিকে ইচ্ছে চলে গেল। এরা দু'জন এখানে এসেছে, গাছতলায় নিজেদের ভাগের মোহর পুঁতে রেখে সদরে ফিরে যাবে। তারপর সুযোগ সুবিধা বুঝে এখানে ফিরে আসবে এবং গুপ্তধন তুলে নিয়ে যাবে।—

সদাশিব গাছে বসে শুনল। সে চুপটি করে রইল; একটু নড়লে চড়লে এরা যদি টের পায় তাহলে তাকে কেটে ফেলবে। যাহোক, গর্ত খোঁড়া হলে ওরা দুটো থলি তার মধ্যে রেখে আবার মাটি চাপা দিল। তারপর কথা বলতে বলতে চলে গেল। সদাশিব শুনতে পেল একজন বলছে,—'সিপাহীর কাজ আর নয়। এবার এই টাকা দিয়ে একটা দোকান খুলব, খুব বড় আতর গোলাপের দোকান। হবে না?'

অন্য সিপাহী বলল,—'আরে মিঞা, ওসব মতলব ছাড। দোকান করলেই লোকের চোখ টাটাবে। তার চেয়ে চুপটি করে ঘরে বসো গিয়ে, আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না।—আমি তো মাল নিয়ে হজ্ করবার নামে বেরিয়ে পড়ব, একেবারে দিল্লীতে গিয়ে বসব। তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই দেখবে ওমরা হয়ে বসেছি। শোভানাল্লা!'

কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল। সদাশিব অনেকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। যখন দেখল কোনও দিক থেকে আর সাড়া-শব্দ আসছে না, তখন সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল।

গর্তের ঢিলা মাটি আঙুল দিয়ে খুঁড়তে বেশি কষ্ট হল না। গর্তের তলা থেকে দুটি থলি বেরিয়ে এল। সদাশিব গুনে দেখল, প্রত্যেক থলিতে চারশো চক্‌চকে সোনার টাকা। সে আগে কখনও সোনার টাকা দেখেনি, চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল।

এই সময় হঠাৎ পিছন দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। সদাশিব চমকে উঠল; ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রায় একশো গজ দূরে নদীর ধার দিয়ে একদল ঘোড়সওয়ার আসছে। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে না, কদম চালে আসছে।

সদাশিব বিদ্যুদ্বেগে সোনার টাকাগুলো নিজের থলিতে ভরল, থলিটা শক্ত করে কোমরে বাঁধল, তারপর আবার গাছে উঠে বসল। গাছের তলায় বেশি আলো নেই, ঘোড়সওয়ারেরা বোধহয় তাকে দেখতে পায়নি।

॥ তিন ॥

ঘোড়সওয়ারের দল সদাশিবের গাছের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন একজন সওয়ার হাত তুলে বলল,—'দাঁড়াও।'

সকলে দাঁড়াল। সওয়ার বলল,—'নদীর কাছে ওটা কী জানোয়ার?'

আর একজন বলে উঠল,—'জয় ভবানী! ঘোড়া! এখানে ঘোড়া এল কোত্থেকে?'

আর একজন বলল,—'ঘোড়া! কোত্থেকে এল জানবার দরকার নেই। ধরে নিয়ে এসো ঘোড়াটাকে। আমাদের দরকার।'

দু'জন সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে নদীর দিকে গেল।

সদাশিব গাছের ওপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল। এরা যে মারাঠা হিন্দু তা এদের কথা শুনেই বোঝা যায়। হয়তো যে ডাকাতের দল বিজাপুরীদের খাজনা লুঠ করেছে এরা তারাই। কিন্তু—এরা যদি সদাশিবের ঘোড়া নিয়ে চলে যায় তাহলে তো ভারি বিপদ! সদাশিব তাহলে শিবাজীর কাছে যাবে কি করে!

সদাশিব গাছের ওপর আর স্থির থাকতে পারল না। হোক ডাকাতের দল, তাই বলে তার ঘোড়া নিয়ে যাবে! সে গাছ থেকে নেমে এল।

ঘোড়সওয়ারের দল হঠাৎ গাছ থেকে একটা লোক নেমে আসছে দেখে অবাক হয়ে গেল—'আরে! এ আবার কে?'

একজন বল্লম বাগিয়ে বলল,—'কে রে তুই?'

সদাশিব মোটেই ভয় পেল না, বলল,—'আমি তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সওয়ারেরা সর্দারকে দেখিয়ে দিল; সদাশিব সর্দারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দারের বয়স বেশি নয়, বড় জোড় কুড়ি একুশ। সর্দার ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, দুই হাতে একজন আহত লোককে

সামনে ধরে আছে। সর্দার কোলের লোকটিকে বলছে,—'যেসা, তোমার কষ্ট হচ্চে না?'

আহত ব্যক্তি বলছে,—'কিছু কষ্ট হচ্চে না। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দাও, আমি ঠিক যেতে পারব।'

এই সময় দু'জন সওয়ার সদাশিবের ঘোড়াটাকে এনে সর্দারের সামনে হাজির করল। তারা ঘোড়ার ছাঁদন-দড়ি খুলে মুখে লাগাম লাগিয়েছে। সর্দার চোখ তুলল। প্রথমেই সদাশিবের ওপর তার নজর পড়ল। সর্দার বলল,—'তুমি কে?'

'আমার নাম সদাশিব। তোমরা আমার ঘোড়া ধরেছ কেন?'

সর্দার বলল,—'ঘোড়ার মালিক তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি ডোঙ্গরপুরে।'

'ডোঙ্গরপুরে! সে তো এখান থেকে অনেক দূর। তুমি গ্রাম থেকে এত দূরে এলে কি করে?'

'আমি শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

সর্দার কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে সদাশিবের পানে চেয়ে রইল—'তাই নাকি? শিবাজীর সঙ্গে তোমার কি দরকার?'

'আমি শিবাজীর অধীনে যুদ্ধ করব।'

সর্দার এবার হাসল, বলল,—'তা বেশ। আমরাও শিবাজীর দলের লোক। তুমি আমাদের সঙ্গেই এস না।'

'যেতে পারি। কিন্তু আমার ঘোড়া?'

'তোমার ঘোড়াটা আমাদের একটু দরকার আছে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের দলের একজন জখম হয়েছে, ওর ঘোড়াটা মরে গেছে। তাই ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঘোড়াটা পেলে ওকে তার পিঠে বসিয়ে দেব। কেমন, দেবে তোমার ঘোড়া! গড়ে পৌঁছে তুমি তোমার ঘোড়া আবার ফেরত পাবে।'

সর্দারের কথা বলবার ভঙ্গী এত মিষ্টি যে 'না' বলা যায় না। সদাশিব রাজী হল, বলল,—'কিন্তু আমি যাব কি করে?'

সর্দার বলল,—'তোমাকে আমি নিজের ঘোড়ায় তুলে নেব। আমার ঘোড়াটা মজবুত আছে, দু'জনের ভার বইতে পারবে।'

তখন কয়েকজন সওয়ার ধরাধরি করে আহত লোকটিকে সর্দারের ঘোড়া থেকে নামিয়ে সদাশিবের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল।

সদাশিব সর্দারের পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসল। ঘোড়সওয়ারের দল আবার আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

চলতে চলতে সদাশিব লক্ষ্য করল, সর্দার ছাড়া অন্য সব সওয়ারের ঘোড়ার দু'পাশ থেকে লম্বা লম্বা ছালা ঝুলছে, দেখলেই বোঝা যায় ছালার ভিতর ভারী মাল আছে। সদাশিবের মনে আর সন্দেহ রইল না যে এরাই বিজাপুরীদের খাজনা লুট করেছে। সঙ্গে একজন আহত লোক রয়েছে, সবই মিলে যাচ্ছে।

সওয়ারের দল আবছায়া জ্যোৎস্নায় উপত্যকার ভিতর দিয়ে লম্বালম্বি চলল। সদাশিব দেখল এরা পাহাড়ের পিঠ বেয়ে বেশি উঠছে না, এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় যাবার গুপ্তপথ কোথায় আছে এরা সব অন্ধিসন্ধি জানে। সেই সব সোজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

চলতে চলতে সর্দারের সঙ্গে সদাশিবের দু'চারটে কথা হল। সর্দার প্রশ্ন করল,—'তুমি গ্রাম থেকে চলে এলে কেন?'

সদাশিব সরলভাবে বলল,—'মামা তাড়িয়ে দিয়েছে।' তারপর গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করল।

শুনে সর্দার বলল,—'মারাঠা দেশে সর্বত্র এই অবস্থা। মোগলদের তাড়াতে না পারলে দেশের অবস্থা ফিরবে না।'

সদাশিব প্রশ্ন করল,—'তোমরা এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?

সর্দার বলল,—'তুমি যখন শিবাজীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছ তখন

সদাশিব গাছের উপর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল

তোমাকে বলতে দোষ নেই। আমরা বিজাপুরীদের খাজনা লুঠতে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হল না। সদাশিবের কোমরে যে লুটের মোহর বাঁধা আছে তা সে বলল না। সর্দারকে বলে কি হবে? বলতে হয় একেবারে শিবাজীকে বলবে।

সদাশিব এবার প্রশ্ন করল,—'তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছ?'

সর্দার বললে,—'আমরা তোর্ণা দুর্গে যাচ্ছি।'

'কিন্তু শিবাজী তো পুণায় থাকেন!'

'এখন তোর্ণা দুর্গে আছেন।'

'তোর্ণা দুর্গ কি শিবাজীর ?'

'কিছুদিন আগে বিজাপুরীদের ছিল, এখন শিবাজীর।'

'শিবাজী ভারি বীর—না ?'

'শিবাজীর দলে সবাই বীর। তুমি শিবাজীর দলে যোগ দিতে যাচ্ছ, তোমাকেও বীর হতে হবে।'

সদাশিব মারাঠা ছেলে, তার শরীরে ভয়-ডর নেই ; সে সহজ-ভাবে বলল,—'হব।'

*　　*　　*　　*

ওরা যখন তোর্ণা দুর্গে গিয়ে পৌঁছল তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। উঁচু টিলার ওপর দুর্গ, লোহার দরজা। দু'জন সওয়ার বল্লমের কুঁদো দিয়ে দরজায় ঘা দিল—'হর হর মহাদেও!' অমনি দরজা খুলে গেল। সকলে দুর্গে প্রবেশ করল।

প্রথমেই আহত লোকটিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে সর্দার এবং আরও কয়েকজন দুর্গের লোক ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। দুর্গের অঙ্গন ঘিরে ঘরের সারি ; মানুষ থাকার ঘর, রান্নাঘর, আস্তাবল, সব আছে। সওয়ারেরা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে আস্তাবলে নিয়ে গেল। সদাশিব একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দুর্গে আরও অনেক লোক আছে, দু'চার জন স্ত্রীলোকও আছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেউ কুঁয়া থেকে জল তুলছে, কেউ কাঠ ফাড়ছে, কেউ তলোয়ারে শান দিচ্ছে, কেউ ঘোড়া দলাই-মলাই করছে ; মেয়েরা এক জায়গায় বসে জাঁতা ঘুরিয়ে জোয়ার-বাজরি পিষছে। সকলেই কাজ করছে।

যে সওয়ারেরা ডাকাতি করতে গিয়েছিল তারা এবার আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের কাঁধে দুটি করে ছালা। তারা ছালাগুলিকে অঙ্গনের মাঝখানে জমা করল। তারপর একজন বয়স্থ কর্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ইনি বোধহয় শিবাজীর খাজাঞ্চি। বড় বড় পাকা গোঁফ, পাকা গালপাট্টা ; মাথায় নাক তোলা পাগড়ী-টুপী। ইনি এসে ছালা উজাড় করে পাথরের মেঝের

ওপর টাকা ঢাললেন। স্তূপাকার রূপার টাকা। সেকালে টাকাকে হোন বলত ; এক হোন চার টাকার সমান।

খাজাঞ্চি গুণে গুণে হোন দু'ভাগ করলেন। সকলে ঘিরে দেখতে লাগল আর নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-তামাশা করতে লাগল। সদাশিব একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল।

টাকা দু'ভাগ করে খাজাঞ্চি প্রথমে এক ভাগ ধামায় ভরে তোশাখানায় রেখে এল। ওটা শিবাজীর অংশ। তারপর বাকি যারা সঙ্গে ছিল তাদের ভাগ বাটোয়ারা শুরু হল। চল্লিশ জন জোয়ান লুঠ করতে গিয়েছিল, টাকা সমান চল্লিশ ভাগ হল। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল একশো আশী হোন। সবাই নিজের নিজের ভাগ নিয়ে চলে গেল।

সদাশিব চমৎকৃত হয়ে দেখছিল। কী মজার এদের জীবন! দলে যোগ দেবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

এই সময় একজন বল্লমধারী রক্ষী এসে বলল,—'তোমার নাম সদাশিব ? এসো, শিবাজী তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে চলল। না জানি শিবাজী কেমন লোক! তিনি কি আমাকে নেবেন ? যদি বলেন, 'তোমার বয়স কম, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না ?'

একটি বড় ঘর ; পাথরের মেঝে, পাথরের দেয়াল ; সরু সরু দুটি জানলা দিয়ে দুর্গের বাইরে দেখা যায়। শিবাজী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বললেন,—'এস সদাশিব।'

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইল। যে সর্দারের সঙ্গে সে এক ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, সেই শিবাজী! এত কম বয়স! এই বয়সে সমস্ত দেশে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে! সে অবাক হয়ে বলল,—'তুমি শিবাজী ?'

শিবাজী বললেন,—'তুমি ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছ দেখছি।—হাঁ, আমিই শিবাজী।'

সদাশিব বললে,—'তুমি নিজে গিয়েছিলে লুঠ করতে ?'

'হাঁ। নিজের কাজ আমি নিজেই করি।'

'তুমি একজন আহত লোককে কোলে করে আনছিলে!'

'ও আমার বাল্যবন্ধু যেসাজী কঙ্ক। ও যদি জখম না হোত

তাহলে দুটো গাড়িই লুঠ করতে পারতাম। কিন্তু সে যাক। তোমার বয়স কত?'

সদাশিব বললে,—'সতেরো কি আঠারো।'

শিবাজী বললেন,—'বেশ, যুদ্ধ করবার বয়স হয়েছে। কিন্তু তোমার হাতিয়ার কৈ? হাতিয়ার না হলে কি দিয়ে যুদ্ধ করবে?'

সদাশিব হাঁ করে চেয়ে রইল—'হাতিয়ার!'

শিবাজী বললেন,—'হাঁ। তলোয়ার বল্লম সাঁজোয়া—এ সব না হলে কি যুদ্ধ করা যায়?'

সদাশিব নিরাশকণ্ঠে বলল,—'এ সব তো আমার কিছু নেই।'

শিবাজী বললেন,—'যারা আমার দলে যুদ্ধ করতে আসে তারা নিজের ঘোড়া আর হাতিয়ার নিয়ে আসে। এখনও সৈন্যদের ঘোড়া আর হাতিয়ার দেবার ক্ষমতা আমার হয়নি, যখন হবে তখন দেব। তোমার ঘোড়া আছে কিন্তু হাতিয়ার নেই। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে?'

হঠাৎ সদাশিবের মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ তার মনেই ছিল না যে তার কোমরে থলির মধ্যে সোনার টাকা আছে। সে লাফিয়ে উঠে বলল—'আমার টাকা আছে, সোনার টাকা!' এই বলে কোমর থেকে থলি খুলে শিবাজীর পায়ের কাছে সব মোহর ঢেলে দিয়ে বলল,—'রাও, এই নাও তোমার ভেট। আমাকে তোমার দলে ভর্তি করে নাও।'

এবার শিবাজী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। শেষে বললেন,— 'এত মোহর তুমি কোথায় পেলে?'

সদাশিব তখন মোহর পাওয়ার ইতিহাস বলল। শুনে শিবাজী খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন,—'সাবাস! আমরা লুঠেছি রূপোর টাকা আর তুমি লুঠেছ সোনার মোহর। তোমার বুদ্ধিও আছে দেখছি। তোমার মতন লোক আমি চাই। সব মোহর আমাকে দিতে হবে না। তবে আমার এখন টাকার দরকার, তাই তোমার টাকা আমার তোশাখানায় জমা রাখলাম। যখন চাইবে তখনই ফেরত পাবে। উপস্থিত একটি মোহর তুমি নিজের কাছে রাখো, এক মোহরে তোমার সমস্ত হাতিয়ার হবে।—তুমি তলোয়ার খেলা জানো?'

সদাশিবের বুক আবার দমে গেল। সে বলল, 'না।'

শিবাজী বললেন,—'সে জন্যে ভাবনা নেই আমার নাপিত জীব মহালা মহারাষ্ট্র দেশের সেরা তলোয়ারবাজ, সে তোমাকে তলোয়ার খেলা শেখাবে। একমাসের মধ্যে তুমি শিখে যাবে।'

সদাশিব উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে,—'আমি কবে তোমার সঙ্গে লড়াই করতে বেরুব রাও?'

শিবাজী তার আগ্রহ দেখে হাসলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—'তার এখনও দেরি আছে। সামনে বর্ষা এসে পড়ল। বর্ষার সময় কোনও কাজ হয় না। এই কয় মাসে তুমিও তৈরি হয়ে যাবে। তারপর দশহরার দিন বেরুব। কি বল?'

'হাঁ রাও।'

শিবাজী তখন খাজাঞ্চিকে ডেকে মোহরগুলো নিয়ে যেতে বললেন। আর তলোয়ারবাজ জীব মহালাকে ডেকে বললেন,—'জীবা, তোমার একজন সাকরেদ এসেছে। ওকে ভাল করে তলোয়ার খেলা শেখাও।'

# সদাশিবের অগ্নিকাণ্ড

॥ এক ॥

তোর্ণা দুর্গে সদাশিবের বর্ষাকালটা ভারি আনন্দে কাটল। সে জীব মহালার কাছে তলোয়ার খেলা শেখে, দুর্গের কাজকর্ম করে। শিবাজীর মা জিজাবাঈ তাকে স্নেহ করেন, নিজের হাতে খাবার তৈরি করে তাকে খেতে দেন। দুর্গে তার সমবয়স্ক জোয়ান অনেক আছে। তাদের সঙ্গে সদাশিবের ভাব হয়েছে। এ যেন একটা প্রকাণ্ড পরিবার; সকলে সকলের আপনার জন। সকলে সকলের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সকলে যুদ্ধে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। এখন বর্ষার এই তিন মাস কাটলে হয়।

মহারাষ্ট্র দেশে বৃষ্টি বেশি হয় না। বর্ষাকালে পশ্চিম সমুদ্র থেকে মেঘ এসে সহ্যাদ্রিতে আটকে যায়, মহারাষ্ট্র দেশে ঢুকতে পারে না। যে দু'চারটে মেঘ কোনও রকমে ঢুকে পড়ে তাতে অল্প বৃষ্টি হয়। কিন্তু পাহাড়ী নদীগুলোতে তখন জলের তোড় বেড়ে যায়; তখন সৈন্য-সিপাহী নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর বড় অসুবিধা। তাই বর্ষাকালে কেউ যুদ্ধ করতে বেরোয় না, দুর্গের মধ্যে কিংবা তাঁবু ফেলে তিনটে মাস কাটিয়ে দেয়।

সদাশিব দুর্গের চূড়া থেকে যখন বাইরের দিকে তাকায় তখন দেখতে পায় চারিদিকের পাহাড় আর উপত্যকার গায়ে সবুজ রঙ ধরেছে। কোথাও পাহাড়ের গা দিয়ে ঝরণা ঝরে পড়ছে। পাহাড় পেরিয়ে সদাশিবের দৃষ্টি নিজের গ্রামের দিকে চলে যায়। ওই ওদিকে তার গ্রাম! গ্রামে কুন্তু আছে। কি করছে সে এখন?

ক্রমে বর্ষা শেষ হয়ে এল। নদীর জল নেমে যাচ্ছে। সকলের মনে উৎসাহ। দশহরার দিন হচ্ছে যুদ্ধযাত্রার দিন। সেদিন সকলে সকলকে তিলক পরায়, কাঞ্চন গাছের পাতা পরস্পরকে দিয়ে ইষ্ট কামনা করে, তারপর 'হর হর মহাদেও' বলে যুদ্ধ করতে বেরোয়। সেই দশহরার দিন আর বেশি দূর নয়, মাত্র পাঁচ দিন।

সেদিন দুপুর বেলা আকাশের মেঘ হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, ধোঁয়া

ধোঁয়া মেঘের ফাঁকে ভিজে রৌদ্র বেরিয়ে পড়েছিল। দুর্গের ছাদের ওপর জিজাবাঈ আর শিবাজী পাশা খেলতে বসেছিলেন। ধাজি রেখে খেলা হচ্ছে। মা বলেছেন—'শিব্বা, তুই যদি আমাকে হারাতে পারিস আমি তোকে দুধি-হালুয়া খাওয়াব, আর যদি হেরে যাস আমাকে নতুন দুর্গ গড়ে দিবি। দুর্গের নাম রাখব রায়গড়।'

শিবাজী বলেছেন—'বেশ, চলে এস। দুধি-হালুয়া আমি খুব ভালবাসি।'

খেলা আরম্ভ হয়েছে। শিবাজীর দুই বন্ধু তানাজী মালসরে আর যেসাজী কঙ্ক পাশে বসে খেলা দেখছেন। সদাশিবও ছাদে আছে। সে তার প্রিয় তলোয়ারটি নিয়ে ছাদে এসেছে। তলোয়ারটি তার চক্ষের মণি, একদণ্ডের তরে চোখের আড়াল করে না। সে মাঝে মাঝে এসে পাশা খেলা দেখছে, তারপর উঠে গিয়ে ছাদের আল্‌সের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও সন্তর্পণে তলোয়ারটি খাপ থেকে বার করে দু'পাক ঘুরিয়ে নিচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সে খুব ভাল তলোয়ার খেলা শিখেছে। তার মন আর ধৈর্য মানছে না। কবে সে সত্যিকারের যুদ্ধে তলোয়ার চালাবে ?

ওদিকে খেলা চলছে, এদিকে সদাশিব আল্‌সের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; হঠাৎ সে দেখতে পেল দূরে একজন সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গের দিকে আসছে। সদাশিব একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কালো রঙের ঘোড়া, সওয়ারের গায়ে লোহার সাঁজোয়া রৌদ্র লেগে ঝল্‌মল্ করে উঠছে। তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সওয়ার আসছে।

সদাশিব হাঁক দিয়ে বলল,—'শিব্বারাও! একজন সাঁজোয়া-পরা ঘোড়সওয়ার আসছে।'

শিবাজী পাশার দান ফেলতে যাচ্ছিলেন, এক লাফে এসে আল্‌সের কাছে দাঁড়ালেন ; তাঁর দুই বন্ধু ছুটে এলেন। সদাশিব আঙুল দেখাল—'ঐ যে !'

শিবাজী চোখের ওপর হাত আড়াল করে কিছুক্ষণ অশ্বারোহীকে দেখলেন। এখনও অশ্বারোহী অনেক দূরে, তার মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে না। তারপর শিবাজী তানাজীর দিকে ফিরে বললেন,—'রত্নাজী মনে হচ্ছে, না রে তানা ?'

তানাজী সওয়ারের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে,—'হুঁ'।

রত্নাজী ছাড়া আর কে হতে পারে? ঐ যে হাত নাড়ছে, আমাদের দেখতে পেয়েছে। রত্নাজীই বটে।'

দুর্গচূড়া থেকে এরাও হাত নাড়ল। শিবাজী বললেন,—'তানা, তুই যা, রত্নাজীকে এখানে নিয়ে আয়। নিশ্চয় জরুরী খবর আছে।'

তানাজী ছাদ থেকে নেমে গেলেন। যেসাজী বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—'সুন্দর ঘোড়াটা। রত্নাজী এমন ঘোড়া পেল কোথায়?'

শিবাজী হেসে বললেন,—'নিশ্চয় চুরি করেছে।'

জিজাবাঈ ডেকে বললেন,—'কি দেখছিস রে শিব্বা?'

শিবাজী মা'র কাছে ফিরে গিয়ে বললেন,—'মা, রত্নাজী আসছে। বোধহয় গুরুতর খবর আছে।'

মা উঠে বললেন,—'আমি তবে যাই, রত্নাজীর জন্যে খাবার তৈরি করি গিয়ে। তোরা এখানেই থাকবি তো?'

'হাঁ মা।'

জিজাবাঈ নেমে গেলেন। শিবাজী আর যেসাজী সেইখানে বসলেন। সদাশিব পিছনে বসল। সে আস্তে আস্তে বলল,—'শিব্বারাও, রত্নাজী কে?'

শিবাজী অসমাপ্ত পাশাখেলার ঘুঁটিগুলি কৌটায় তুলে রাখতে রাখতে বললেন,—'রত্নাজী আমার গুপ্তচর। সে পদাতি সৈনিক সেজে বিজাপুরী ফৌজের সঙ্গে আছে।'

ব্যাপার বুঝে সদাশিব চমৎকৃত হয়ে রইল। শুধু তলোয়ার ঘোরানো নয়, দেশ উদ্ধার করতে হলে আরও অনেক কাজ করতে হয়।

কিছুক্ষণ পরে রত্নাজীকে নিয়ে তানাজী এলেন। শিবাজী উঠে রত্নাজীকে আলিঙ্গন করলেন। রত্নাজীর বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর; মজবুত চেহারা, মুখে দাড়িগোঁফ আছে। যেসাজী তাকে আলিঙ্গন করে বললেন,—'রত্না, এমন ঘোড়া কোথায় পেলে?'

রত্নাজী হেসে উঠল, বলল,—'সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ'র ঘোড়া। সেনাপতির অনেকগুলো ভাল ঘোড়া আছে। আমার ওপর হুকুম হয়েছিল ঘোড়াগুলোকে সকাল বিকেল টহল দেওয়াবার। তা আমি আজ সকালবেলা সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটার পিঠে চড়ে চলে এলাম।'

সকলে হাসল। তারপর শিবাজী গম্ভীর হয়ে বললেন,—'এবার আসল খবর বল।'

রত্নাজী বলল,—'আসল খবর ভাল নয়। বিজাপুরের সাত হাজার ফৌজ তোর্ণা দুর্গ অবরোধ করতে আসছে। ওরা খবর

শিবাজী উঠে রত্নাজীকে আলিঙ্গন করলেন

পেয়েছে তুমি বর্ষার সময় তোর্ণা দুর্গে আছ, তাই বর্ষা শেষ হবার আগেই বেরিয়েছে। ওদের মতলব তোমাকে দুর্গ থেকে বেরুতে দেবে না, দুর্গ ঘেরাও করে কামান দিয়ে দুর্গ চুরমার করে দেবে। ওদের সঙ্গে কুড়িটা কামান আর একশো পিপে বারুদ আছে।'

খবর শুনে তিন বন্ধু গালে হাত দিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবাজী মুখ তুলে বললেন,—'ওরা এখন কতদূরে?'

রত্নাজী বলল,—'সকালবেলা পনরো ক্রোশ দূরে ছিল। সঙ্গে কামান আছে তাই আস্তে আস্তে আসছে; আমার বিশ্বাস কাল দুপুর বেলা এসে পৌঁছবে।—পনরো দিন আগে আমরা বেরিয়েছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা জানতাম না; কেবল সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ আর তার চার পাঁচজন পার্ষদ জানত।

কাল রাত্রে সেনাপতির তাঁবুতে মজলিশ বসেছিল, মুর্গী আর শিরাজি চলছিল। আমি কানাতের বাইরে পাহারায় ছিলাম। ওদের কথা শুনে জানতে পারলাম তোর্ণা দুর্গে তোমাকে ঘেরাও করতে আসছে। ব্যাস্, আজ সকালে কেউ জেগে ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম।'

শিবাজী আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। সদাশিব ভাবতে লাগল—কি সর্বনাশ, সাত হাজার ফৌজ! সঙ্গে কামান! কি করে শিবজীরাও রক্ষা পাবেন? কি করে দুর্গ রক্ষা পাবে? হে মা ভবানী, আমাকে বুদ্ধি দাও, যেন শিবাজী মহারাজকে রক্ষা করতে পারি।

অনেকক্ষণ পরে শিবাজী কথা কইলেন। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললেন,—'তোমরা কি বল? এখন উপায় কি?'

তানাজী বললেন,—'তুমি বল। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

শিবাজী তখন বলতে আরম্ভ করলেন—'তোর্ণা দুর্গে এখন মাত্র আড়াইশো যোদ্ধা আছে। আড়াইশো লোক নিয়ে সাত হাজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। ওদের সঙ্গে কামান আছে, আমাদের একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই। এ অবস্থায় উপায় কি? দুটো রাস্তা আছে। এক, দুর্গ ছেড়ে পালানো। তাতে প্রাণ বাঁচবে বটে, কিন্তু দুর্গ ওদের দখলে চলে যাবে। দ্বিতীয় রাস্তা, দুর্গের তোরণ বন্ধ করে বসে থাকা। কিন্তু ওদের সঙ্গে কুড়িটা কামান আছে। তোর্ণা ছোট দুর্গ, ওরা কামান দেগে দুর্গ ধুলো করে উড়িয়ে দেবে।'

শিবাজী চুপ করলেন। সকলে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল। শেষে যেসাজী বললেন,—'এ ছাড়া অন্য রাস্তা নেই?'

শিবাজী প্রশ্ন করলেন,—'এ দুটো রাস্তার একটাও তোমাদের পছন্দ নয়?'

সকলে এক সঙ্গে মাথা নাড়লেন,—'না।'

শিবাজী তখন একটু হেসে বললেন,—'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা—বারুদের পিপে।'

সবাই অবাক। 'বারুদের পিপে!'

'হাঁ। ওদের সঙ্গে একশো পিপে বারুদ আছে। সেই বারুদই এখন আমাদের ভরসা।'

তানাজী বললেন,—'বারুদ আমাদের ভরসা! কি বলছ তুমি, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে বলছি শোন।' এই বলে শিবাজী দ্রুতকণ্ঠে তাঁর মতলব প্রকাশ করে বললেন। শুনে সকলের চোখ উৎসাহে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল। তানাজী নিজের উরুতে প্রচণ্ড চড় মেরে বললেন,—'আমি যাব।'

যেসাজী বললেন,—'তোর যে প্রকাণ্ড চেহারা, তোকে মানাবে না। আমি যাব।'

রত্নাজী করুণ স্বরে বলল,—'আমাকে যে দেখলেই চিনে ফেলবে। নইলে আমি যেতাম।'

শিবাজী বললেন,—'তোমাদের কাউকে দিয়ে হবে না।'

তানাজী বললেন,—'তবে কি তুমি যাবে নাকি? না, সে হবে না। তোমাকে আমরা যেতে দেব না। শেষকালে যদি—'

শিবাজী বললেন,—'না, আমি যাব না। যাবে সদাশিব।'

সদাশিব শিবাজীর পিছনে বসে শুনছিল, সে চমকে উঠল। শিবাজী তাকে সামনে টেনে এনে বললেন,—'সদাশিব দেখতে ছোটখাটো, এখনও ভাল করে গোঁফ বেরোয়নি; তাছাড়া ওর বুদ্ধি আছে। এ কাজ যদি কেউ পারে তো সদাশিব।'

আনন্দে সদাশিবের বুক নেচে উঠল। সে বলল,—'রাজা, কি করতে হবে আমাকে শিখিয়ে দাও।'

শিবাজী তখন সদাশিবকে শেখাতে আরম্ভ করলেন।

## ॥ দুই ॥

পরদিন ভোরবেলা, তখনও সূর্যোদয় হয়নি, দুর্গের লৌহকবাট একটু ফাঁক হল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সদাশিব আর একপাল ছাগল। কবাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সদাশিবের গায়ে ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়। তার ডান হাতে পাঁচনবাড়ি; পাঁচনবাড়ির মুঠ লোহা দিয়ে বাঁধানো। বাঁ হাতে নারকেল ছোবড়ার লম্বা দড়ি গোল করে পাকানো। সে একবার পিছন ফিরে দুর্গদ্বারের পানে তাকাল, তারপর ছাগলের পিছন পিছন চলল।

দুর্গে গোটা কুড়ি ছাগল থাকে, কারণ মা জিজাবাঈ ছাগলের দুধ খান। একটা ছোট ছেলে রোজ ছাগলগুলোকে চরাতে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ সে আসেনি, তার বদলে সদাশিব ছাগল চরাতে বেরিয়েছে।

ছাগলগুলো লাফাতে লাফাতে ম্যা ম্যা করে ডাকতে ডাকতে চলল। দুর্গের কাছে-পিঠে ঘাস বা ঝোপঝাড় নেই ; পাথর ছড়ানো মাটি। তারপর ক্রমে ঘাস গজাতে শুরু করেছে ; সমতলে নেমে এলে শুধু ঝোপঝাড় নয়, দু'চারটে বড় গাছও দেখা যায়। বর্ষার জলে সব সবুজ হয়ে উঠেছে। ছাগলগুলো সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চরতে লাগল।

সূর্য উঠল। আজ আকাশে বেশি মেঘ নেই। সদাশিব ছাগলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, আর তার চোখ দুটো চারদিকে ঘুরছে। যেদিক থেকে কাল দুপুরবেলা রত্নাজী ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, সেই দিকে তার চোখ বার বার যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে এখনো মানুষের সাড়াশব্দ নেই। পেছনে দুর্গের কালো মূর্তি আকাশের গায়ে মাথা তুলেছে। সব ঘিরে শুয়ে আছে উঁচু-নীচু পাহাড়ের সারি। নিস্তব্ধ সকাল।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। ছাগলেরা ঝোপঝাড় খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে, সদাশিব তাদের পিছনে আছে। দু'একটা ছাগল যখন এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে, তখন তাদের তাড়িয়ে দলে ফিরিয়ে আনছে। সদাশিব গাঁয়ের ছেলে, ছাগল চরানো তার কাছে নতুন নয়। ছাগল চরাতে চরাতে সে বেশ খানিকটা দূরে চলে এল।

মাঝে মাঝে রৌদ্র ফুটে বেরুচ্ছে আবার মেঘের আড়ালে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ; পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া ওঠা-নামা করছে। মাটিতে অসংখ্য পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে চক্‌মকি পাথর আছে ; সেগুলো সূর্যের আলো লেগে ঝক্‌মক করে উঠছে। সদাশিব এক টুকরো নুড়ির মত চক্‌মকি পাথর হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। সে নুড়িটা কোমরে গুঁজে নিয়ে আবার ছাগলের পিছনে চলল।

সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। সদাশিব ছাগলের পাল নিয়ে দুর্গ থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে এসে পড়েছে, এমন সময় পাহাড়ের দিক থেকে আওয়াজ শুনে সে কান খাড়া করল। আওয়াজ নয়, আওয়াজের প্রতিধ্বনি। গ্রীষ্মকালে শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে

যখন দুপুর বেলার গরম হাওয়া বয়ে যায়, তখন যে-রকম শব্দ হয় সেই রকম শব্দ। বিজাপুরের সাত হাজার ফৌজ আসছে। এখনও তাদের চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আসছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে তাদের দেখা গেল। ঐ দূরে পাহাড়ের ফাঁক থেকে পিল্‌পিল্‌ করে বেরুচ্ছে! আগে আগে আসছে ঘোড়-সওয়ারের দল, তার পিছনে পদাতিক; তার পরে কুড়িটা গরুর গাড়ির ওপর কুড়িটা কামান। প্রত্যেক গরুর গাড়ি টানছে আট দশটা বলদ; তারপর আরও অগুনতি গরুর গাড়িতে তাঁবু রসদ আরও কত কি।

এক সঙ্গে এত মানুষ সদাশিব জীবনে কখনও দেখেনি। সে চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল, তার বুক দুরদুর করে উঠল। সে মনে মনে মা ভবানীর নাম স্মরণ করল, তারপর ছাগলগুলোকে একটা ঝোপের মধ্যে জড়ো করে চুপটি করে বসে রইল।

*   *   *   *

বেলা তিন প্রহরে বিজাপুরী সৈন্য তোর্ণা দুর্গের সামনে থানা দিয়ে বসল। দুর্গের কাছে গেল না, কারণ দুর্গে যদি বন্দুক থাকে তবে পাল্লার বাইরে থাকাই ভাল; দুর্গদ্বার থেকে তিনশো গজ দূরে চক্রাকারে ঘিরে বসল। অসংখ্য তাঁবু দেখতে দেখতে খাড়া হল; তাদের মাঝখানে সেনাপতির প্রকাণ্ড শিবির। চারদিকে লোক লস্কর হুকুম-বরদার খানসামা পিল্‌পিল্‌ করতে লাগল। কড়্‌কড়্‌ কড়্‌কড়্‌ শব্দে নাকাড়া বেজে উঠল। ছাউনির পিছন দিকে বাবুর্চিখানা, সেখানে সাত হাজার সিপাহীর রান্না চড়ল।

সেনাপতির শিবিরের সামনে দিওয়ান পাতা হয়েছে; পুরু গালিচার ওপর বড় তাকিয়া। লিয়াকৎ খাঁ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে গড়গড়া টানছেন। তিনি বয়স্থ ব্যক্তি, ঝানু সেনাপতি। গড়গড়া টানতে টানতে তিনি দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। দু'জন পার্ষদ হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে বসে আছে। সেনাপতি ক্লান্ত, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছেন।

সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ দুর্গের দিক থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'পাহাড়ী ইঁদুর খাঁচায় ধরা পড়েছে, পালাতে পারেনি।'

একজন পার্ষদ বললেন,—'পালাবার সময় পায়নি। পালালে কিল্লার দরজা খোলা থাকত।'

সেনাপতি বললেন,—'ও থেকে কিছু বলা যায় না। শিবাজী ভয়ানক ধূর্ত, দু'জন লোককে কিল্লায় রেখে বাকি সকলকে নিয়ে পালাতে পারত। কিন্তু পালায়নি ; দুর্গেই আছে। আমি চরের মুখে খবর পেয়েছি।'

অন্য পার্ষদ জিজ্ঞাসা করলেন,—'আর সেই বেইমান ঘোড়া-চোরটা ?'

সেনাপতির মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন,—'সে হারামখোর কুত্তাটা শিবাজীর গুপ্তচরই বটে, কাল দুপুরবেলা কিল্লায় এসেছে। শিবাজী খবর আগেই পেয়েছে, কিন্তু লুঠের মাল নিয়ে পালাবার সময় পায়নি। এখন আর যাবে কোথায় ? সবাইকে একসঙ্গে তোপের মুখে উড়িয়ে দেব।'

এই সময় একজন জোয়ান ফৌজদার এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল,—'হজরৎ, বারুদের পিপে ছাউনির পিছন দিকে কানাত ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। কামানগুলো এখনও গরুর গাড়ি থেকে নামানো হয়নি। এখন কি করতে হবে হুকুম করুন।'

সেনাপতি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালেন ; সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। তিনি বললেন,—'আজ সন্ধ্যা হয়ে এল। কামান গরুর গাড়ি থেকে নামাবার দরকার নেই। কাল সকালে দুর্গের সামনে কামান বসাব। আজ আর কোনও কাজ নেই, তোমরা আরাম করো গিয়ে। রাত্রে যেন পাহারা পুরাদস্তুর থাকে।'

'জো হুকুম।' ফৌজদার সেলাম করে চলে গেল।

সেনাপতি কিছুক্ষণ বসে গড়গড়া টানলেন ; তারপর হঠাৎ পাশের দিক থেকে মিহি গলার ম্যা ম্যা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন। তার সঙ্গে সিপাহীদের হাসির হল্লা। শব্দটা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি চোখ পাকিয়ে তাকালেন। কী ব্যাপার !

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, দুই সারি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে এক পাল ছাগল আসছে, তাদের পিছনে একজন সিপাহী একটা ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছে। তাদের আশেপাশে একদল সিপাহী হাসতে হাসতে আসছে। তাঁবুতে ছাগলের পাল ! মজা দেখবার জন্যে সিপাহীরা সঙ্গে চলেছে।

যে-সিপাহী সদাশিবের কোমরে ছাগল-দড়ি বেঁধে নিয়ে আসছিল, সে সেনাপতির সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সেনাপতি বললেন,—'কাণ্ডটা কি? এ ছেলেটা কে? এত ছাগল কোত্থেকে এল?'

সিপাহী বলল,—'হজরৎ, এই ছেলেটা ছাগলগুলোকে নিয়ে ছাউনির পশ্চিমদিকের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ম্যা ম্যা শব্দ শুনে আমি গিয়ে ওকে ধরেছি।'

'সাবাস!' সেনাপতি তাঁর বড় বড় চোখ সদাশিবের দিকে ফিরিয়ে মোটা গলায় বললেন,—'তুই কে রে?'

সদাশিব ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

যে সব সিপাহী মজা দেখতে এসেছিল তারা হো হো করে হেসে উঠেই আবার চুপ করল। সেনাপতির সামনে হাসলে গোস্তাকি হয়।

সেনাপতি দেখলেন ছেলেটার বয়স চৌদ্দ পনরোর বেশি নয়। তাঁর সামনে এসে খুব ভয় পেয়েছে। তিনি গলার আওয়াজ একটু নরম করে বললেন,—'ভয় নেই। তুই ছাগল কোথায় পেলি?'

সদাশিবের কান্না একটু কমল। সে বলল,—'দুর্গের ছাগল। আমি চরাই।'

সেনাপতি তখন তাকে জেরা আরম্ভ করলেন,—'তুই দুর্গে থাকিস?'

সদাশিব বলল,—'হ্যাঁ।'

'শিবাজী দুর্গে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আর কে আছে?'

'আরও দু'শো তিনশো লোক আছে?'

'কাল বাইরে থেকে দুর্গে কোনও লোক এসেছিল?'

'আমি জানি না। আমি ভোর বেলা ছাগল চরাতে বেরুই। সন্ধ্যেবেলা দুর্গে ফিরে যাই।'

'আজ ফিরে যাসনি কেন?'

'ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় তোমরা এসে পড়লে। আমি ভয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম।'

সদাশিবের আকার-প্রকার দেখে সেনাপতি লিয়াকৎ খাঁ'র

বিশ্বাস হল যে সে সত্যি কথা বলছে ; তাঁর সামনে মিথ্যে কথা বলবে এত বুদ্ধি তার নেই। তিনি তখন সিপাহীকে বললেন,—'ওর কোমরের দড়ি খুলে দাও।'

দড়ি খোলা হলে সদাশিব দড়ি আর লাঠি হাতে মাটিতে বসে আবার কাঁদতে শুরু করল।

সেনাপতি বললেন,—'আবার কি হল।'

সদাশিব বলল,—'আমি দুর্গে ফিরে যাব।'

'দুর্গে ফিরে যাবি কি করে? দুর্গের দোর যে বন্ধ!'

'আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?'

সিপাহীরা হেসে উঠল। সেনাপতিও একটু হাসলেন। বললেন,—'এটাকে নিয়ে যা, কিছু খেতে দে। আর ছাগলগুলোকে বাবুর্চিখানায় পাঠিয়ে দে।'

* * * *

যে-সিপাহী সদাশিবকে ধরে এনেছিল সে তাকে বাবুর্চিখানার দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল,—'কি খাবি?'

সদাশিব বলল,—'বাজ্‌রির রুটি আর চিঞ্চের চাট্‌নি।'

বাজ্‌রির রুটি আর তেঁতুলের চাট্‌নি! সিপাই হেসে উঠল। বলল,—'কোফ্‌তা কাবাব খাবি না?'

সদাশিব বলল,—'সে কাকে বলে?'

'গোস্ত্‌! গোস্ত্‌! খাসনি কখনো?'

'না, ও খেলে জাত যায়। ও আমি খাব না।'

বিজাপুরী ফৌজে অনেক হিন্দু সৈন্যও ছিল; তাদের আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। সিপাহী সদাশিবকে সেইখানে নিয়ে গেল। খোলা জায়গায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না চড়েছে, অনেক টিকিধারী পাচক রান্না করছে। সিপাহী একজনকে ডেকে বলল,—'সেনাপতির হুকুম। এই ছেলেটাকে খেতে দাও।'

পাচক জিজ্ঞাসা করল,—'এ কে?'

সিপাহী বলল,—'অত খোঁজে তোমার দরকার কি? যা বলছি কর।' বলে সিপাহী চলে গেল।

সদাশিব একা। ছাগলগুলোকে অন্য সিপাহীরা কান ধরে

মুসলমানদের বাবুর্চিখানায় নিয়ে গেছে। সদাশিবের মনে একটু দুঃখ হল, কিন্তু কি করবে? সে দড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিল, লাঠিটা পাশে রেখে মাটিতে বসে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। এটা ছাউনির পিছন দিক। কিছু দূরে দুই সারি গরুর গাড়ির ওপর মোটা মোটা কামান চাপানো রয়েছে, যেন তাল গাছের গুঁড়ি। দুই সারির মাঝখানে সরু গলির মত জায়গায় কানাত ঢাকা কুপোর মতো জিনিস রয়েছে। দু'জন দাড়িওয়ালা চৌকিদার বল্লম কাঁধে গরুর গাড়ির সারির দু'পাশে পাহারা দিচ্ছে। সদাশিব আন্দাজ করল, কানাত ঢাকা জিনিসগুলি বারুদের পিপে। পাছে বৃষ্টি হয়, বারুদ ভিজে যায়, তাই কানাত ঢাকা রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে পাচক সদাশিবকে খাবার এনে দিল। জোয়ারির মোটা রুটি, তুরের ডাল, আর তেলাকুচোর ভাজি, তার সঙ্গে ঘি। সদাশিব পেট ভরে খেল।

তখনও রাত্রি হয়নি, কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সদাশিব খাওয়া শেষ করে উঠে ছাউনির এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চারিদিকে লোক লস্কর হামাল পিয়াদা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। সদাশিবকে কেউ গ্রাহ্য করল না।

ক্রমে রাত্রি হল, চারিদিকে মশাল জ্বলে উঠল। প্রত্যেক তাঁবুতে ভারে ভারে খাবার যাচ্ছে, সিপাহীরা খেতে বসেছে। এই ফাঁকে সদাশিব রাত্রির মত একটা আস্তানা খুঁজতে বেরুলো।

যেখানে কামানের গরুর গাড়ি সাজানো ছিল সেখান থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে এক গাদা ফাল্‌তু তাঁবু আর কানাত পড়ে ছিল। সদাশিব তারই মধ্যে গিয়ে গুটিসুটি পাকিয়ে শুয়ে রইল। আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গরুর গাড়ির দু'পাশে দু'জন চৌকিদার টহল দিচ্ছে। সদাশিব পাঁচনবাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

## ॥ তিন ॥

বেশ এক ঘুম দিয়ে সদাশিব চোখ মেলল। চাঁদ অস্ত গেছে, আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এক আকাশ তারা ঝল্‌মল্ করছে। ছাউনিতে সাড়া শব্দ নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সদাশিব তাঁবু আর কানাতের বিছানার ওপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। কোমরে হাত দিয়ে দেখল নারকেল ছোবড়ার দড়ি আর চকমকি পাথর ঠিক আছে, লোহা বাঁধানো পাঁচনবাড়িও হাতের কাছে আছে। এতক্ষণে তার চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে; তার কানও খুব তীক্ষ্ণ। সে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসে রইল।

না, ছাউনির সবাই ঘুমোয়নি, চৌকিদারেরা জেগে আছে। কামানের পাশে দু'জন চৌকিদার আগের মতই টহল দিচ্ছে; তাছাড়া কয়েকজন চৌকিদার মশাল জ্বালিয়ে সমস্ত ছাউনি ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। তারা চক্কর দিতে দিতে মাঝে মাঝে চিৎকার করে হাঁক দিচ্ছে—'হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! দুশমনের এলাকায় সাবধানে ঘুমোও।' মশালের আলোতে চৌকিদারদের দেখে মনে হয় ওরা মানুষ নয়। প্রেতমূর্তি; ওদের বিকট হাঁক শুনে পিলে চমকে ওঠে।

সদাশিব মনে মনে মা ভবানীর নাম স্মরণ করে নিল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর গাদা থেকে নামল। যেদিকে বারুদের পিপে কানাত-ঢাকা আছে সেই দিকে চলল। কালো বিড়াল অন্ধকারে যেভাবে চলে সেইভাবে চলল। একটু শব্দ হল না।

যে চৌকিদারগুলো ছাউনির চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে তারা অন্য দিকে চলে গেল। যে দু'জন কামান পাহারা দিচ্ছে তাদের মশাল নেই, অন্ধকারেই পাহারা দিচ্ছে; তারা একবার কামানের সারির এধারে আসছে, একবার ওধারে চলে যাচ্ছে। সদাশিব কামানের সারির দশ-বারো গজের মধ্যে এসে একটা ঝোপের আড়ালে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল। চৌকিদার দু'জন এদিকেই আসছে।

সদাশিব নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগল। চৌকিদারদের পায়ের শব্দ এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তারা নীচু গলায় কথা কইছে। একজন বলল,—'কি মিঞা, ঠাণ্ডা লাগছে?'

দ্বিতীয় চৌকিদার বলল,—'হাঁ আগা, বেশ ঠাণ্ডা। পাহাড়ে দেশ, তাই রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে। একটু আগুন জ্বালতে পারলে বড় ভাল হত।'

আগা বলল,—'খবরদার! আগুনের নাম মুখে এনো না। বারুদের কাছে আগুন জ্বাললে গর্দানে মাথা থাকবে না।'

ঝোপের আড়ালে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়লো

উত্তরে মিঞা কি বলল শোনা গেল না, তারা আবার কামানের সারির ছু'পাশ দিয়ে উল্টো দিকে ফিরে চলল। তাদের কথা শুনে সদাশিব নিশ্চিন্ত হল, বারুদের পিপে এখানেই আছে।

তাদের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পর সদাশিব ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল, হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার মত গরুর গাড়ির দিকে চলল্ল। তাকে যদি কেউ দেখতে পেত, মনে করত একটা প্রকাণ্ড কাঁক্ড়া গর্ত থেকে বেরিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে ; মানুষ বলে চিনতে পারত না।

দশ-বারো গজ এইভাবে গিয়ে সদাশিব সামনের গরুর গাড়ির

তলায় লুকিয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় শুনতে পেল চৌকিদারেরা ফিরে আসছে। সদাশিব গরুর গাড়ির তলায় মাটির সঙ্গে মিশে নিঃসাড়ে বসে রইল।

চৌকিদারেরা সাম্‌না-সাম্‌নি হয়ে আবার কথা কইল। সদাশিব তাদের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ; তারা এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে হাত বাড়িয়ে তাদের ছুঁতে পারে।

একজন বলল,—'মিঞা, এ সময় এক পেয়ালা শিরাজি হলে কেমন হত ?'

মিঞা বলল,—'শিরাজি মাথায় থাক, এক ভাঁড় তাড়ি পেলে বর্তে যেতাম আগা।'

আগা গলার মধ্যে হাসল, তারপর দু'জনে আবার ফিরে চলল। তাদের পায়ের আওয়াজ যখন দূরে চলে গেল তখন সদাশিব গরুর গাড়ির তলা থেকে ভিতর দিকে যেখানে কানাত ঢাকা বারুদের পিপে আছে সেইখানে ঢুকে পড়ল, কানাতের কোণ তুলে তার তলায় লুকিয়ে রইল। এখানে বেশ নিরাপদ, বাইরে থেকে দেখা যাবার ভয় নেই।

এতক্ষণে সদাশিব ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছে। এবার আসল কাজ। কানাতের তলায় কিছু দেখা যাচ্ছে না, মিশ্‌মিশে অন্ধকার। সদাশিব হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল। তার হাতে ঠেকল একটা পিপের গা।

পিপের ওপর তক্তা ঢাকা, তার ওপর কানাত। সদাশিব তক্তার তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল ; বালির মতন গুঁড়ো পিপেতে ভরা রয়েছে। শিবাজী মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সদাশিবের বুঝতে বাকি রইল না যে এ বারুদই বটে। তার বুক নেচে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ—ঢং ঢং ঢং ঢং। নিঃশব্দ রাত্রির মাঝখানে এই আওয়াজ যেন আকাশ ফাটিয়ে বেরিয়ে এল।

কিছুই নয়, ছাউনিতে রাত দুপুরের ঘণ্টা বাজছে ! কিন্তু সদাশিব প্রস্তুত ছিল না, তাই একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা থেমে যাবার পরও সে খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তারপর শুনতে পেল ছাউনির চৌকিদারেরা হাঁক দিতে দিতে চলে গেল—'হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার—!'

সদাশিব চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। এইবার!

কোমর থেকে নারকেল ছোবড়ার দড়ি খুলে তার একটা মুখ সে পিপের বারুদের মধ্যে গুঁজে দিল, দড়ির অন্য মুখটা মাটিতে রেখে কষি থেকে চক্‌মকি পাথরের নুড়ি বার করল। পাঁচনবাড়ির মুঠ লোহা বাঁধানো। সদাশিব অতি সন্তর্পণে লোহা দিয়ে চক্‌মকি ঠুকতে লাগল। ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। খুব আস্তে ঠুকতে হবে, কানাতের বাইরে আওয়াজ না যায়! চৌকিদারেরা যদি আওয়াজ শুনতে পায় তাহলেই সর্বনাশ।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। আগুনের ছোট ছোট ফুল্কি বেরিয়ে ছোবড়ার দড়ির মুখে পড়তে লাগল। ক্রমে দড়ির মুখে আগুন ধরল। একটুখানি আগুন, প্রায় চোখে দেখা যায় না; কিন্তু একবার যখন ধরেছে তখন আর নিভবে না। দড়ি পুড়তে পুড়তে আগুন বারুদের পিপেয় গিয়ে ঢুকবে। তখন···

বাইরে চৌকিদার দু'জন নিশ্চিন্ত মনে টহল দিচ্ছে। তারা জানে না তাদের হাতের কাছে কী ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলেছে।

তারপর সুযোগ বুঝে সদাশিব কানাতের তলা থেকে বেরিয়ে এল। ছায়ার মতো ছাউনি পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে দুর্গের দিকে ছুটল। কেউ কিছু জানতে পারল না।

দুর্গের দরজায় সদাশিব পাঁচনবাড়ির ঠোকা দিল। স্বয়ং শিবাজী দরজা খুলে দিলেন। তাঁর পিছনে দুর্গের সমস্ত লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করলেন,—'কাজ হয়েছে?'

সদাশিব বলল,—'হয়েছে।'

শিবাজী দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

*    *    *    *

দুর্গের ছাদে আল্‌সের ধারে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ভেদ করে তাদের দৃষ্টি দূরে ওই ছাউনির ওপর গিয়ে পড়েছে। ছাউনি ভাল দেখা যাচ্ছে না; কেবল তারার আলোয় শাদা তাঁবুর আভা। আর তাদের ঘিরে জোনাকির মতো মশালের আলো পাক খাচ্ছে।

শিবাজী মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর এক পাশে সদাশিব, অন্য পাশে তানাজী আর যেসাজী। কারুর মুখে কথা নেই, সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ কবে প্রতীক্ষা করছেন। নির্দয় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—নারকেল ছোবড়ার দড়ির মুখে এতটুকু আগুন।

সময় যেন আর কাটে না। একটি মুহূর্ত কাটছে আর সদাশিব ভাবছে—কী হল? এখনও কিছু হচ্ছে না কেন? তিন হাত দড়ি জ্বলতে এতক্ষণ সময় লাগে? তবে কি আগুন নিবে গেছে!···

ক্রমে পুবের আকাশে একটুখানি আলোর ছোঁয়া লাগল, দক্ষিণ দিক থেকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে—

হঠাৎ ছাউনির মাটি বিদীর্ণ করে আগুনের একটা উচ্ছ্বাস আকাশে ছড়িয়ে পড়ল; তার তীব্র আলোতে চোখ ঝলসে যায়। তারপর এল আওয়াজ। কী ভীষণ আওয়াজ! এক লক্ষ রাক্ষস যেন একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। একটা দমকা হাওয়া আগুনের হল্কার মতো দুর্গের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আবার অন্ধকার।

'হর হর মহাদেও!'

দুর্গের ছাদে তানাজী টপ করে সদাশিবকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগলেন। শিবাজী বললেন,—'জয় মা ভবানী!—চল, এখনি দুর্গ থেকে বেরুতে হবে।'

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে শিবাজী তাঁর আড়াইশো সৈন্য নিয়ে বেরুলেন। যেখানে ছাউনি ছিল সেখানে ছাউনির চিহ্ন নেই; প্রায় পাঁচশো সিপাহীর মৃতদেহ পড়ে আছে। জ্যান্ত মানুষ একটাও নেই, সব পালিয়েছে। ঝল্‌সানো মাটির ওপর কেবল তালগাছের গুঁড়ির মত কামানগুলো পড়ে আছে, গরুর গাড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তবু ছাউনিতে এবং তার আশপাশের জায়গায় অনেক জিনিস পাওয়া গেল। টাকা মোহর হাঁড়িকুড়ি বল্লম তলোয়ার, আরও কত ধাতুনির্মিত জিনিস। শিবাজীর সৈন্যেরা যে যা পেল দখল করল।

শিবাজী কামানগুলোকে দখল করলেন। কামান দুর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। একটা কামান তুলে নিয়ে যেতে ত্রিশজন করে

লোক লাগল। অনেক কামানের গোলাও চারিদিকে পড়ে ছিল, সেগুলোকেও আনা হল। শিবাজী বললেন,—'এই কামান দিয়ে আমি তোর্ণা দুর্গ রক্ষা করব। যত ইচ্ছা শত্রু আসুক, আর ভয় করি না।'

সদাশিব বলল,—'কিন্তু—বারুদ?'

শিবাজী বললেন,—'বারুদ তৈরি করতে জানে এমন আতস কারিগর পুণায় আছে, তাদের নিয়ে আসব। বারুদ তৈরি করা শক্ত নয়, কামান ঢালাই করাই শক্ত। এখন কামান পেয়েছি, আর কারুর সাধ্য নেই তোর্ণা দুর্গ কেড়ে নেয়।'

বিকেল বেলা সবাই দুর্গে ফিরে এলেন। সবাই আনন্দে আত্মহারা, সবাই সদাশিবকে কাঁধে তুলে নাচতে চায়। কিন্তু সদাশিব পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কাঁধে উঠে নাচা তার অভ্যাস নেই।

সন্ধ্যার সময় জিজাবাঈ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—'কি খাবি বল।'

সদাশিব বলল,—'দুধির হালুয়া।'

সদাশিব আগে কখনও দুধির হালুয়া অর্থাৎ লাউয়ের হালুয়া খায়নি।

# সদাশিবের দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

॥ এক ॥

শিবাজীর বাবা শাহজি ভোঁস্‌লে ছিলেন বিজাপুর রাজ্যের একজন মন্সবদার। তাঁকে বিজাপুর দরবারে থাকতে হত; সুলতান যখন যেখানে যেতে হুকুম করতেন তখন দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হত। পুণা ছিল শাহজির খাস জায়গীর, কিন্তু পুণায় তিনি বেশি আসতে পারতেন না; শিবাজী তাঁর মা জিজাবাঈকে নিয়ে পুণায় থাকতেন। বাপের সঙ্গে ছেলের দেখা সাক্ষাৎ হত না। এই কারণে শিবাজী পিতৃশাসনের বাইরে স্বাধীনভাবে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

বড় হয়ে শিবাজী যখন বিজাপুরের দুর্গগুলি একে একে দখল করতে আরম্ভ করলেন তখন সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ শাহজিকে ডেকে বললেন,—'এ কি রকম কথা! তুমি আমার মন্সবদার, আর তোমার ছেলে আমার দুর্গ কেড়ে নিচ্ছে! তুমি ছেলেকে শাসন করতে পার না?'

শাহজি বললেন,—'হজরৎ, আমার ছেলে বড় দুষ্টু, আমি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছি। সে আমার শাসন মানে না; আপনিই তাকে শাসন করুন।'

সুলতান মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর একবার ইচ্ছা হল শাহজিকে হুকুম করেন—তুমি আমার পক্ষ থেকে সৈন্য নিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। শাহজি যদি যুদ্ধ করতে গিয়ে দলবল নিয়ে ছেলের সঙ্গে মিলে যান তাহলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে। সুলতান বললেন,—'আচ্ছা, তোমার ছেলেকে আমিই শাসন করব।—তুমি যাও, সেনাপতি মুস্তাফা খাঁকে জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করতে পাঠাচ্ছি, তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দাও।'

জিঞ্জি দুর্গ বিজাপুরের দক্ষিণে, আর পুণা বিজাপুরের উত্তরে,

পুণা থেকে জিঞ্জি প্রায় তিনশো ক্রোশ দূরে। শাহজি জিঞ্জি চলে গেলেন। তারপর আদিল শাহ শিবাজীকে দমন করবার অনেক চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত সাত হাজার সৈন্য পাঠালেন। এই সাত হাজার সৈন্যের কী দশা হল তা আমরা জানি।

বিজাপুরের সাত হাজার সৈন্য বারুদের বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পর তোর্ণা দুর্গে সারা দিন খুব আনন্দ উৎসব চলল। শত্রু নিপাত হয়েছে, এখন আর দশহরার দিন যুদ্ধ যাত্রা করবারও দরকার নেই। বিনা যুদ্ধে শত্রুকে ঘায়েল করেছেন শিবাজী।

কিন্তু তবু আনন্দ উৎসবের মধ্যেও শিবাজীর মনে একটা দুশ্চিন্তা আনাগোনা করছে। এই সেনা-নিপাতের খবর যখন বিজাপুর দরবারে পৌঁছবে তখন সুলতান কী করবেন? শিবাজীকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই, কিন্তু শিবাজীর বাবা শাহজি তাঁর মুঠোর মধ্যে। রাগের জ্বালায় সুলতান যদি শাহজিকে হত্যা করেন?

পরদিন বিকেল বেলা শিবাজী বন্ধুদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। বন্ধুদের মধ্যে তানাজী যেসাজী আর বাজি পসল্কর। মা জিজাবাঈও বসে মন্ত্রণা শুনছেন। ছেলেদের মন্ত্রণার সময় জিজাবাঈ প্রায়ই উপস্থিত থাকেন। হাজার হোক ওরা ছেলেমানুষ, যদি কাঁচা কাজ করে ফেলে তাই তিনি নজর রাখেন। কিন্তু নিতান্ত দরকার না হলে কথা বলেন না।

সদাশিব সেদিন মন্ত্রণা-সভায় ছিল না। সারা দিন হৈ হৈ করার পর সে আস্তাবলে গিয়ে নিজের ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করছিল। ঘোড়াটি এ কয় মাসে খেয়ে দেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়েছে।

'সদাশিউউউ—' কে ডাকছে? তানাজীর মোটা ভরাট গলা। সদাশিব তাড়াতাড়ি আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ওপর দিকে তাকালো। ছাদের আল্‌সের কাছে দাঁড়িয়ে তানাজী হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছেন।

সদাশিব ঘোড়ার ডলাই-মলাই ছেড়ে তখনি ওপরে উঠে গেল। নিশ্চয় গুরুতর ব্যাপার।

ছাদের মাঝখানে সভা বসেছে। শিবাজী কথা বলছেন, আর সকলে বসে শুনছে। সদাশিব চুপিচুপি গিয়ে শিবাজীর পিছনে বসল।

শিবাজী বলছেন,—'বিজাপুরে খবর পৌঁছতে অন্তত চার পাঁচ দিন লাগবে। একবার খবর পৌঁছলে চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে যাবে, তখন সুলতান কী করবেন কিছুই বলা যায় না। তাই খবরটা সুলতানের কাছে পৌঁছনোর আগেই বাবার কাছে পৌঁছনো দরকার। তারপর খবর পেয়ে তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।'

বাজি পসল্কর বললেন,—'ঠিক কথা। আগে খবর পেলে শাহজি পুণায় পালিয়ে আসতে পারেন। তখন আর সুলতান তাঁর নাগাল পাবেন না।'

শিবাজী বললেন,—'হ্যাঁ। কিন্তু বাবা বিজাপুরে উপস্থিত না থাকতে পারেন, হয়তো সুলতানের হুকুমে তাঁকে অন্য কোথাও যেতে হয়েছে। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর কাছে খবর যাওয়া চাই। এখন কথা হচ্ছে, কে যাবে খবর নিয়ে। শত্রুর রাজধানীতে যাওয়া, মানে প্রাণ হাতে করে যাওয়া। ধরা পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। তাই এমন লোককে পাঠাতে হবে যে চতুর এবং সাহসী ; যার ধড়া পড়বার সম্ভাবনা কম। কে যাবে ?'

বাজি পসল্কর বললেন,—'তুমি যাকে হুকুম করবে সেই যাবে।'

তানাজী বললেন,—'শিব্বা আমাকে হুকুম কর, আমি যাব।'

শিবাজী হেসে বললেন,—'তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি শিবাজীর বন্ধু একথা অনেকেই জানে, তোমার চেহারাটাও এমন যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুমি গেলে ধরা পড়বার ভয় বড় বেশি।'

'তবে কাকে পাঠাতে চাও ?'

শিবাজী হাত বাড়িয়ে সদাশিবকে সামনে টেনে আনলেন। বললেন,—'এই ছেলেটাকে পাঠাতে চাই। ওর যে বুদ্ধি আছে সাহস আছে সে-পরিচয় ও দিয়েছে। উপরন্তু ওকে আমার দলের লোক বলে এখনো কেউ চেনে না। শত্রুপক্ষের যারা ওকে দেখেছিল তারা কেউ বেঁচে নেই। সুতরাং ওকে পাঠানোই সব চেয়ে নিরাপদ।'

সকলে নীরব রইলেন ; শিবাজীর দূত-নির্বাচন যে ঠিক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কেবল জিজাবাঈ একটু আপত্তি তুললেন, —'সদাশিব বড্ড ছেলেমানুষ, ও কি পারবে অতদূর যেতে ? যদি রাস্তা ভুলে যায়—'

শিবাজী হেসে উঠলেন,—'সদাশিব রাস্তা ভোলবার ছেলে নয়। কি বলিস সদাশিব ?'

সদাশিব লজ্জিত হয়ে বলল,—'না, রাস্তা ভুলব না। আমি দেখতে ছোট বটে কিন্তু আঠারো বছর বয়স হয়েছে। যেখানে যেতে বলবে আমি যেতে পারব। কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি ঠিক বিজাপুরে গিয়ে পৌঁছব।'

শিবাজী বললেন,—'রাস্তা তোকে দেখিয়ে দেব। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, যত শিগ্‌গির পারিস পৌছতে হবে।'

সদাশিব বলল,—'আমার ঘোড়া খেয়েদেয়ে বেশ মোটা হয়েছে, সে আমাকে যতদূর বলো নিয়ে যেতে পারবে।'

শিবাজী মাথা নেড়ে বললেন,—'তোর ঘোড়া পারবে না। রাস্তায় অনেক নদী পার হতে হবে; তোর ঘোড়া সাঁতার কাটতে পারবে না, টুপ করে ডুবে যাবে। আমার একটা ঘোড়া আছে, তার নাম সিন্ধুঘোটক, সেই ঘোড়ায় চড়ে তুই যাবি। তিন মণ বোঝা ঘাড়ে করে সে কৃষ্ণা-গোদাবরী পার হতে পারে।'

সদাশিব সিন্ধুঘোটককে চিনত। আস্তাবলে শিবাজীর খাস ঘোড়া দশ বারোটা ছিল, তার মধ্যে সিন্ধুঘোটক একটা। গোলগাল নাদা-পেট ঘোড়া, বেশি জোরে দৌড়ুতে পারে না, কিন্তু ভারি মজবুত। সদাশিব উৎসাহিত হয়ে উঠল। শিবাজীর খাস ঘোড়ায় চড়ে সে যাবে, কত বড় সম্মান। সে লাফিয়ে উঠে বলল,—'তাহলে এখনি বেরিয়ে পড়ি না কেন ?'

শিবাজী আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তিনি বললেন,—'আজ আর হবে না। কাল ভোর বেলা তুই বেরুবি। তোকে বিজাপুরের রাস্তায় পৌছে দিয়ে আসব।—কিন্তু একটা কথা। বাবা তোকে চেনেন না, যদি তোর কথায় বিশ্বাস না করেন ?'

জিজাবাঈ নিজের হাত থেকে একটি তামার কবচ খুলে নিয়ে সদাশিবের হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন,—'এই কবচ তাঁকে দেখাস, তিনি চিনতে পারবেন। তোরও কবচ ধারণ করলে মঙ্গল হবে, ওতে মা ভবানীর ফুল আছে।'

॥ দুই ॥

পরদিন তখনও সূর্য ওঠেনি, সবেমাত্র পূর্বদিক ফরসা হয়েছে, এমন সময় সদাশিব ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বেরুল। সঙ্গে আছেন শিবাজী আর তানাজী।

সদাশিবের গায়ে ফরসা জামা কাপড়, পায়ে জুতো। জিজাবাঈ তার চোখে কাজল পরিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিয়েছেন। সদাশিবকে আর চেনা যায় না; তিনদিন আগে যে-ছেলেটা ছেঁড়া জামা কাপড় পরে ছাগল চরাতে বেরিয়েছিল, কে বলবে এ সেই ছেলেটা।

শিবাজী আর তানাজী আগে আগে ঘোড়া চালিয়ে চললেন, পিছনে নাদুস-নুদুস ঘোড়ার পিঠে সদাশিব। তার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ঢাল তলোয়ার কিছু নেই, শুধু আছে কোমরে গোঁজা একটি ছোট ছুরি, আর একটা খাবার ভরা ছালা। তাছাড়া ট্যাঁকে আছে গণ্ডা কয়েক তামার পয়সা। তখনকার দিনে একলা মানুষের বেশি টাকাকড়ি নিয়ে রাস্তা চলা নিরাপদ ছিল না; সবাই চোর, সবাই ডাকাত। শিবাজী তাই সদাশিবকে এমনভাবে পাঠাচ্ছেন যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

তিন দিন আগে তোর্ণা দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের যে গিরিসংকট দিয়ে বিজাপুরী ফৌজ এসেছিল সেই গিরিপথ দিয়ে শিবাজী আর তানাজী সদাশিবকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চললেন। ক্রমে সকাল হল, চারিদিক শিশির-ভেজা আলোয় 'ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। সদাশিব দেখল, পাথর ছড়ানো রাস্তার ওপর তখনো কামান-বোঝাই গরুর গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। মানুষগুলো নেই, কিন্তু চাকার দাগ রয়েছে। সাত হাজার মানুষের মধ্যে একটাও কি বেঁচে নেই? হয়তো দু'চার জন আছে, প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে কে জানে।

পাহাড়ের এলাকা পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় পৌঁছতে বেলা প্রায় দুপুর হল। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে সড়ক গিয়েছে; খুব ভাল রাস্তা নয়, তবু রাস্তা; ঘোড়ার পিঠে যাওয়ার অসুবিধা নেই।

শিবাজী সামনের দিক আঙুল দেখিয়ে বললেন,—'এই রাস্তা

বিজাপুরে গিয়েছে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে গ্রাম আছে। রাত্তিরে গ্রামে থাকবি, কিন্তু যেখানে বেশী মানুষের ভিড় সেখানে যাবি না। বিজাপুর সহরে পৌঁছতে পাঁচ-ছয় দিন লাগবে। সেখানে কাজ সেরেই ফিরে আসবি। রাস্তা চিনে ফিরে আসতে পারবি তো?'

সদাশিব বলল,—'পারব?'

'যা যা বলে দিয়েছি মনে আছে?'

'আছে।'

'আচ্ছা তাহলে এবার বেরিয়ে পড়। জয় ভবানী।'

'জয় ভবানী' বলে সদাশিব ঘোড়া চালাল। শিবাজী আর তানাজী ঘোড়ার পিঠে বসে চেয়ে রইলেন। সদাশিবের ঘোড়া যখন অনেক দূরে চলে গেল তখন তাঁরা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আবার তোর্ণা দুর্গে ফিরে চললেন।

সদাশিব চলেছে। এখন সে একলা, গুরুতর কাজের ভার তার মাথায়। কিন্তু তার মনে ভয় হল না। বরং সে এই ভেবে উদ্দীপনা অনুভব করতে লাগল যে এখন থেকে যা কিছু করবার সে নিজের বুদ্ধিতে করবে।

ঘোড়াটা দুল্‌কি চালে চলেছে; খুব জোরেও নয়, খুব আস্তেও নয়। এই চালে চললে দিনে অন্তত পনরো-ষোল ক্রোশ যাওয়া চলবে। সিন্ধুঘোটকের পিঠটি বেশ চৌরশ, মনে হয় যেন সিংহাসনে বসে আছি। তার মেজাজও বেশ ঠাণ্ডা। সদাশিব মনের আনন্দে চলল।

সূর্য মাথার ওপর উঠে পশ্চিমে হেলে পড়ল। সদাশিব মনের আনন্দে ক্ষিদে তেষ্টার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু সিন্ধুঘোটক ভোলেনি। প্রায় দু'ঘড়ি চলবার পর এক জায়গায় এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার ডান্ন দিক থেকে ঝর্ণার জল এসে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে; কাকচক্ষু জল, জলের তলায় বালি তক্‌তক্‌ করছে। সিন্ধুঘোটক জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘাড় নীচু করে চোঁ চোঁ শব্দে জল খেতে লাগল।

সদাশিবের মনে পড়ল এখনও খাওয়া হয়নি। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে খাবারের থলিটি নিয়ে রাস্তার ধারে একটি পাথরের ওপর গিয়ে বসল।

জিজাবাঈ অনেক খাবার দিয়েছেন। ঘিয়ে ভেজা জোয়ারির রুটি, ছোলার ডালের ঝাল চক্‌রি, মোতিচুরের লাড্ডু, আরও কত কি। এমন সব জিনিষ দিয়েছেন যা দু'এক দিনে নষ্ট হয়ে যাবে না। খাওয়া শেষ করে সদাশিব দেখল থলির একটা কোণও খালি হয়নি। সে উঠে পড়ল, আঁজ্‌লা ভরে ঝর্ণার জল খেয়ে সিন্ধুঘোটককে ডাকল।

সিন্ধুঘোটক ইতিমধ্যে রাস্তার ধার থেকে বেশ খানিকটা ঘাস খেয়ে পেট ভরিয়ে নিয়েছে। সদাশিব তার পিঠে উঠে বসল; দু'জনে ঝর্ণার আধ হাঁটু জল পার হয়ে দুল্‌কি চালে চলল।

রাস্তায় লোক চলাচল নেই। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে লোকালয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়, দু'চারটে মাটির ঘর যেন ভয় পেয়ে একত্র জড়ো হয়েছে। কিন্তু ঘরগুলি শূন্য, একটিতেও মানুষ নেই। কয়েকদিন আগে বিজাপুরী ফৌজ এই দিক দিয়ে গিয়েছিল, তাদেরই ভয়ে মানুষগুলো পালিয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি।

সদাশিব চলেছে। ক্রমে সূর্য যখন পশ্চিম দিকের পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়েছে তখন সে এক নদীর ধারে এসে পৌঁছল। বেশ বড় নদী, এপার ওপার প্রায় দু'শো গজ। সদাশিব আন্দাজ করল, এই নীরা নদী। নীরা নদী সহ্যাদ্রি থেকে বেরিয়ে আরও পুব দিকে গিয়ে ভীমা নদীর সঙ্গে মিলেছে।

নদীর কিনারে রাস্তার ধারে গ্রাম রয়েছে, কিন্তু গ্রামে মানুষ নেই। ঘাটের কাছে একটা নৌকা আধ ডুবন্ত অবস্থায় কানা জাগিয়ে আছে। বোধহয় খেয়ার নৌকা।

এইখানে নদী পার হতে হবে। কারণ রাস্তাটা এইখানে নদীতে ডুব দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে। সদাশিব ঠিক করল আজ রাত্রিটা এইখানেই কাটাবে। অনেক শূন্য ঘর পড়ে রয়েছে, একটা ঘরে রাত কাটিয়ে ভোর হতে না হতে আবার যাত্রা শুরু করবে।

এই সময় সিন্ধুঘোটক ঘাড় উঁচু করে একবার চিঁহি শব্দ করল; একটা ঘোড়া আর একটা ঘোড়ার গন্ধ পেলে যেরকম শব্দ করে সেই রকম। সদাশিব চারিদিকে তাকাল কিন্তু ঘোড়া বা মানুষ কাউকে দেখতে পেল না। সে তখন ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশ ধরে গ্রামের মধ্যে ঢুকল।

সবসুদ্ধ কুড়ি পঁচিশটা মেটে ঘর, একটা গরু-বাছুরের গোয়াল,

আর কিছু নেই। সব ঘরের দরজা খোলা। সদাশিব কয়েকটা ঘরে উঁকি মেরে দেখল ভিতরে কিচ্ছু নেই। গ্রামবাসিরা সব কিছু নিয়ে পালিয়েছে।

গোয়ালে উঁকি মেরে সদাশিব আশ্চর্য হয়ে গেল—একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। মেহদি রঙের বড় ঘোড়া, পাহাড়ী ঘোড়া নয়। এ ঘোড়া এখানে কোথা থেকে এল!

ঘোড়াটা সদাশিবকে দেখে কান খাড়া করে নাকের মধ্যে শব্দ করল, সিন্ধুঘোটক তার উত্তর দিল। সদাশিব দেখল ঘোড়াটার সামনের ডান পায়ের হাঁটুতে ন্যাকড়ার ফেট্টা বাঁধা রয়েছে, সে নড়তে চড়তে খোঁড়াচ্ছে।

সদাশিব আস্তে আস্তে গোয়াল ঘরের সামনে থেকে সরে এল। ঘোড়ার মালিক নিশ্চয় এই গ্রামের মধ্যে আছে, কিন্তু বেশিদিন নয় আজই এখানে এসেছে। কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাচ্ছে? সামনে আসছে না কেন? তবে কি চোর ডাকাত?

সূর্য অস্ত গিয়েছে, আকাশের মাঝখানে আধখানা চাঁদ নিজেকে স্পষ্ট করে তুলছে। সদাশিব গ্রামের সামনের দিকে ফিরে এল। একটা বড় কুঁড়ে ঘর, বোধহয় গাঁয়ের পাটিলের ঘর; তার দরজায় হুড়কো আছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। সদাশিব ঠিক করল এই ঘরেই রাত কাটাবে। ঘরের সামনে খানিকটা খোলা মাঠ, তাতে বেশ বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। সিন্ধুঘোটক এই মাঠে চরবে।

সদাশিব সিন্ধুঘোটকের মুখ থেকে লাগাম খুলে নিল, পিঠ থেকে কম্বল খুলে ঘরের মধ্যে রাখল। এই কম্বলটা হবে তার বিছানা। তারপর সে ঘরের দোরে বসে থলি নিয়ে রাত্রির খাওয়া খেতে বসল।

কিন্তু তার মনে অস্বস্তি লেগে আছে। গোয়ালে বাঁধা খোঁড়া ঘোড়ার মালিক কে? এখানে লুকিয়ে আছে কেন? ঘোড়া বেঁধে রেখে যদি চলে গিয়ে থাকে? না, তা সম্ভব নয়; এই কুঁড়ে ঘরগুলোর মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ঘোড়া ফেলে কেউ চলে যায় না। একটা ঘোড়া যখন, মানুষও নিশ্চয় একটা। কিন্তু লুকিয়ে আছে কেন? সদাশিবকে দেখে ভয় পেয়েছে, তাই লুকিয়ে আছে?

ইতিমধ্যে জ্যোৎস্না ফুটেছে; নীলাভ কুয়াশার মত ঝাপসা আলোয় চারিদিকে আচ্ছন্ন। সদাশিব খাওয়া সেরে নদীর ধারে গিয়ে জল খেয়ে এল।

কোথাও জন মানুষের সাড়াশব্দ নেই। সিন্ধুঘোটক নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। সদাশিব দোরের হুড়কো লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা মানুষ যদি থাকেই তাতে ভয় কি? সদাশিবের কাছে ছুরি আছে। সে ছুড়িটি কোমর থেকে বার করে মাথার পাশে নিয়ে শুলো। কাল ভোরেই উঠে নদী পার হতে হবে।...

অনেক রাত্রে সিন্ধুঘোটকের নাক ঝাড়ার শব্দে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল। দরজার পাশে ছোট্ট ঘুলঘুলি, তাই দিয়ে সে বাইরে উঁকি মারল।

তখনও চাঁদ অস্ত যায়নি, কিন্তু অস্ত যেতে বেশি দেরিও নেই। সিন্ধুঘোটক ঘাস খেয়ে পেট ভরিয়ে মাঠের মাঝখানে বসে আছে। একটা লোক খোঁড়া ঘোড়াটার লাগাম ধরে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোয় সদাশিব লোকটার মুখ দেখতে পেল। মুখে দাড়ি—

লোকটা আঙুলে তুড়ি দিয়ে মুখে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করল, কিন্তু সিন্ধুঘোটক উঠল না, আবার নাক ঝাড়া দিল। লোকটা সন্তর্পণে চারিদিকে তাকিয়ে সিন্ধুঘোটকের কোমরে আস্তে একটা লাথি মারল, যাতে সে উঠে দাঁড়ায়। সিন্ধুঘোটক কিন্তু উঠল না।

মুহূর্তমধ্যে সদাশিব সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারল। লোকটা কে, কেন এখানে লুকিয়ে আছে, তার ঘোড়া কেন খোঁড়া, কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। সে ঘুলঘুলি দিয়ে গলা বাড়িয়ে মুখে বিকট শব্দ করল,—'হর্‌র্‌র্—ভুং কটকট—হুক্ক হুক্ক—!'

লোকটা চমকে উঠে এক লাফে নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, তারপর ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে পালাল। সদাশিব তখন হুড়কো খুলে বাইরে এল। দেখল, ঘোড়সওয়ার নদীর দিকে যাচ্ছে। তারপর ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হল। ঘোড়া নদী পার হচ্ছে।

সদাশিব ঘরে ফিরে এসে আবার দরজায় হুড়কো লাগাল। লোকটা মুসলমান। বিজাপুরের যে ফৌজ তোর্ণা আক্রমণ করতে এসেছিল, লোকটা সেই দলে ছিল; ঘোড়াটাও ছিল। কোনও রকমে ওদের দু'জনেরই প্রাণ বেঁচে যায়। কেবল ঘোড়াটার হাঁটু জখম হয়। এখন খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে লোকটা বিজাপুরে খবর দিতে যাচ্ছে। পাছে শিবাজীর এলাকায় ধরা পড়ে তাই লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে।

সদাশিব ঠিক করল, যেমন করে হোক ওই লোকটার আগে তাকে বিজাপুরে পৌঁছতে হবে। কিন্তু আজ রাত্রেই তাকে তাড়া করবার দরকার নেই। খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে সে কতদূর যাবে ?

সদাশিব আবার কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—লোকটা বোধহয় সিন্ধুঘোটককে চুরি করবার মতলবে ছিল! ভাগ্যিস ঠিক সময়ে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল! নৈলে সকাল বেলা উঠে দেখত সিন্ধুঘোটক অদৃশ্য হয়েছে, তার বদলে খোঁড়া ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে।

॥ তিন ॥

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সদাশিব বেরিয়ে পড়ল। নদীর জল সূর্যোদয়ের আগে বেশি ঠাণ্ডা মনে হয় না, তাই নদী পার হতে তার বেশি কষ্ট হল না। নীরা নদী এখানে প্রায় দু'শো গজ চওড়া হলেও কিনারার জল গভীর নয়, মাঝখানে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ অথৈ জল। সিন্ধুঘোটক সদাশিবকে পিঠে নিয়ে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে গেল, সদাশিব কেবল পা দুটো তুলে তার পিঠের ওপর বসে রইল।

নদী থেকে উঠে সিন্ধুঘোটক একবার গা ঝাড়া দিল। সদাশিব আর একটু হলেই তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলে নিল। তারপর সিন্ধুঘোটক আবার দুল্‌কি চালে চলতে আরম্ভ করল।

রাস্তায় রাহী নেই। রাস্তার ধারে একটা ছোট গ্রাম পড়ল, কিন্তু গ্রামে জনমানব নেই। শূন্য চারিদিক, তার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা উঠছে নামছে, কখনও গিরিস্কন্ধের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ারকে কিন্তু দেখা গেল না। সে বোধ হয় সারারাত ঘোড়া চালিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বেলা বাড়তে লাগল। ক্রমে দুপুর হল।

একটি গ্রাম। সদাশিব দূর থেকে দেখল এখানে দু'চারজন লোক ফিরে এসেছে। গ্রামের সামনে দিয়ে যাবার সময় সদাশিব ঘোড়া দাঁড় করালো, হাত তুলে হাঁক দিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা

কেউ কাছে এল না, লাঠি হাতে সন্দিগ্ধভাবে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সদাশিব আবার হাঁক দিল। তখন একজন বুড়ো লোক এগিয়ে এসে বলল,—'তুমি কে? কি চাও?'

সদাশিব বলল,—'আমি রাহী। জরুরী কাজে বিজাপুরে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন?'

বুড়ো বলল,—'বিজাপুরের সিপাহীরা আমাদের গ্রাম লুটে নিয়েছে। তুমি কি বিজাপুর দলের লোক?'

সদাশিব বলল,—'না না, আমি পুণার লোক। দেখছ না আমি মারাঠী।'

বুড়ো বলল,—'তবে বিজাপুরে যাচ্ছ কেন?'

এ প্রশ্নের জবাব সদাশিবের তৈরি ছিল, সে বলল,—'আমার মামাকে খুঁজতে যাচ্ছি।—বলতে পারো, এ রাস্তা দিয়ে খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে কেউ গিয়েছে?'

বুড়ো বলল,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভোর বেলা গিয়েছে, তখনও সূর্য ওঠেনি। সেই বুঝি তোমার মামা?'

মামাই বটে! একেবারে সাক্ষাৎ কংস মামা। সদাশিব আর দাঁড়াল না, ঘোড়া চালিয়ে দিল।

খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার রাতারাতি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। যাহোক, সন্ধ্যার আগেই সদাশিব তাকে ধরে ফেলবে।

রাস্তায় আর বড় নদী নেই; তবে ছোটখাটো ঝরণা অনেক আছে। সদাশিব ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই দুপুরের খাওয়া শেষ করল; ঘোড়াটাকে ঘাস খাবার জন্যে কিছুক্ষণ ছেড়ে দিল। তারপর আবার চলল।

কিন্তু খোঁড়া ঘোড়ার দেখা নেই। সন্ধ্যে হয় হয়, সূর্য ডুবুডুবু। কোথায় গেল ঘোড়াটা? তবে কি রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথ ধরেছে? উঁহু, পাহাড়ের পথে যাওয়া খোঁড়া ঘোড়ার কর্ম নয়। নিশ্চয় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গেল কোথায়?

সন্ধ্যা হল, চাঁদের আলো ফুটল। সেই কালকের চাঁদ, আজ একটু বড় হয়েছে। সদাশিব থামল না, চলতেই লাগল। যদি একটা শূন্য গ্রাম পায় তার শূন্য ঘরে রাত কাটাবে। নৈলে গাছের ডালে রাত কাটাতে হবে। তাছাড়া খাবারও ফুরিয়ে এসেছে, বড় জোর কাল সকাল পর্যন্ত চলবে। খাবার জোগাড় করতে হবে।

ঘোড়াটাও ক্লান্ত, চলতে চলতে থেমে যাচ্ছে। আবার তার পেটে গোড়ালির গুঁতো মেরে চালাতে হচ্ছে।

এই রকম এক জায়গায় সিন্ধুঘোটক থেমেছে, হঠাৎ সদাশিবের কানে এল ঠুং ঠুং ঘন্টির আওয়াজ। এ আওয়াজ সদাশিবের চেনা ; গাঁয়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘন্টি বাজছে।

সদাশিব পাশের দিকে তাকালো কিন্তু গ্রাম দেখতে পেল্ল না। খানিকটা চড়াই উঠেছে, তার গায়ে মানুষের পায়ে হাঁটা পথের মত অস্পষ্ট চিহ্ন। হয়তো চড়াইয়ের ওপারে গ্রাম আছে, রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে না। সদাশিব ঘোড়া থেকে নেমে তার রাশ ধরে সেইদিক পানে চলল।

এবড়ো-খেবড়ো চড়াই। পঞ্চাশ-ষাট গজ গিয়ে সদাশিব তার মাথায় উঠল। হ্যাঁ, সামনেই চড়াইয়ের কোলে একটি ছোট গ্রাম। ত্রিশ চল্লিশটি খড়-ছাওয়া কুটির, কিন্তু একটি কুটিরেও বাতি জ্বলছে না। চাঁদের আলোয় শূন্য গ্রামটি নিঝুম হয়ে আছে।

সদাশিব অবাক হল। গ্রামে কেউ নেই, তবে ঘন্টি বাজাচ্ছিল কে ? ঠিক এই সময় সদাশিব আবার শুনতে পেল ঘন্টির শব্দ— ঠুং ঠুং ঠুং। গ্রামের ভিতর থেকেই শব্দ আসছে।

সিন্ধুঘোটককে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে সদাশিব নেমে গেল। গ্রামের কুঁড়েঘরগুলি অবিন্যস্তভাবে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে যাতায়াতের পথ। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সে হঠাৎ দেখতে পেল একটি ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। পাথরের মন্দির ; বোধহয় গ্রামের মধ্যে এই একটিমাত্র পাকা বাড়ি। কিন্তু লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সদাশিব পা টিপে টিপে সেইদিকে চলল। মন্দিরের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দেখল, ভিতরে বিঠোবার মূর্তি রয়েছে ; আর, একটি মেয়ে মন্দিরের মধ্যে বসে পূজা করছে।

মেয়েটি দরজার দিকে পিছন ফিরে পূজা করছিল, তাই সদাশিবকে দেখতে পেল না। সদাশিব দেখল, মেয়েটি একলা, তার সঙ্গে অন্য কেউ নেই।

সদাশিব সন্তর্পণে যেই আর এক-পা বাড়িয়েছে অমনি পায়ের তলায় পাথরকুচি পড়ে একটু শব্দ হল। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে

দেখল, তারপর অস্ফুট চিৎকার করে ধড়মড়িয়ে উঠে মন্দিরের দোর ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ দু'পক্ষই চুপচাপ। তারপর সদাশিব গলা ঝাড়া দিয়ে বলল,—'ভয় পেও না, আমি তোমার অনিষ্ট করব না।'

মন্দিরের ভিতর থেকে সাড়াশব্দ এল না। তখন সদাশিব আবার বলল,—'আমার কোনো বদ মতলব নেই। তুমি যদি ভয় পাও আমি চলে যাচ্ছি।'

সে কিন্তু চলে গেল না, অপেক্ষা করে রইল। খানিক পরে মন্দির থেকে মেয়েলি মিহি গলায় আওয়াজ এল,—'তুমি কে? কি চাও?'

সদাশিব বলল,—'কিচ্ছু চাই না। আমি মারাঠী, হিন্দু। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ঘন্টির শব্দ শুনে এসেছি। এটা কি বিঠ্‌ঠলের মন্দির?'

ভিতর থেকে মেয়েটি বলল,—'হ্যাঁ। তুমি বিজাপুরের সিপাহী নও?'

সদাশিব বলল,—'না, আমি পুণা থেকে আসছি।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর খুট করে শব্দ হল, দরজা একটু ফাঁক করে মেয়েটি উঁকি মারল। সে দেখল আগন্তুক ছেলেমানুষ, তার হাতে অস্ত্রশস্ত্রও নেই; শুধু একটা ঝুলি। দরজা আর একটু ফাঁক করে সে বলল,—'তোমার নাম কি?'

'সদাশিব।'

'এখানে কি চাও?'

'বলেছি তো কিছু চাই না। মন্দিরের ঘন্টি শুনতে পেয়ে এসেছি। তুমি বিঠ্‌ঠলের পুজো করছিলে?'

'হ্যাঁ।'

সদাশিব মন্দিরের পৈঁঠায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, তারপর বলল,—'গাঁয়ে লোকজন কেউ নেই কেন?'

মেয়েটি এবার বেরিয়ে এল, বলল,—'বিজাপুরী সিপাহীরা এসেছিল, তাই গাঁয়ের লোক সব পালিয়েছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

সদাশিব এবার মেয়েটিকে ভাল করে দেখল। সামনে থেকে চাঁদের আলো আর পিছন থেকে প্রদীপের আলো তার গায়ে

পড়েছে। কালোকোলো মেয়েটি, ছোটখাটো গড়ন; বেশ শ্রী আছে। বয়স এগারো-বারো বছরের বেশি নয়। সে এই নির্জন গ্রামে একলা কী করছে!

সে জিজ্ঞাসা করল,—'তুমি এখানে একলা আছ?'

মেয়েটি একটু হাসল, বলল,—'না, আমিও পালিয়েছি। আমার বাবা বিঠ্‌ঠলের পূজারী; তিনি বুড়ো মানুষ, তার ওপর বিজাপুরীদের হাতে যখম হয়েছেন। তিনি আসতে পারেন না, তাই আমি বিঠ্‌ঠলের পুজো দিতে আসি।'

সদাশিব একটা নিশ্বাস ফেলে পৈঁঠার উপর বসল, বলল—'বিজাপুরী সিপাহীরা বড় অত্যাচার করে—না? শিবাজীর সৈন্য কিন্তু গ্রামের লোকের ওপর অত্যাচার করে না।'

মেয়েটির এতক্ষণে ভয় কেটেছে, কৌতূহল দেখা দিয়েছে। সেও চাতালের ওপর বসল। বলল,—'শিবাজীর নাম শুনেছি। তুমি বুঝি শিবাজীর দলের লোক?'

সদাশিব একটু ঘাড় নাড়ল। এই মেয়েটিকে দেখে, ওর কথা শুনে কুঙ্কুর কথা মনে পড়ে যায়। সে বলল,—'আমার গাঁয়ে তোমার মতন একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুঙ্কু। তোমার নাম কি?'

মেয়েটি একটু ঘাড় বেঁকিয়ে বলল,—'সেবন্তী'।

তারপর দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। সেবন্তীর মনে ভারি কৌতূহল, সে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সদাশিব এক সময় বলল,—'সেবন্তি বহিন, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিতে পার?'

'দিচ্ছি' বলে সেবন্তী মন্দির থেকে জল এনে দিল, সদাশিব ঢক্‌ঢক্ করে এক ঘটি জল খেয়ে ফেলল।

ঘটি রেখে এসে সেবন্তী আবার বসল। বলল,—'সদাশিব ভাই, তোমার থলিতে কী আছে?'

সদাশিব বলল,—'খাবার। কিন্তু বেশি নেই, সব ফুরিয়ে এসেছে। কাল কি খাব তাই ভাবছি।'

সেবন্তী প্রশ্ন করল,—'তুমি এখন কি করবে? রাত্তিরে কি এখানেই থাকবে?'

সদাশিব বলল,—'তাই ইচ্ছে। তোমার যদি অমত না থাকে।

কোনও একটা ঘরে শুয়ে থাকব, সকাল হলেই চলে যাব।—সেবন্তি বহিন, তুমি আমাকে কিছু খাবার দিতে পার? আমি এমনি চাই না, আমার কাছে পয়সা আছে।'

সেবন্তী গালে হাত দিয়ে খানিক ভাবল, তারপর বলল,—'গ্রামে তো খাবার জিনিষ কিছু নেই। যা ছিল তার বেশির ভাগই বিজাপুরী সিপাহীরা লুটে নিয়ে গেছে। বাকি গ্রামের লোকেরা গুহায় নিয়ে গেছে।'

সদাশিব বলল,—'তবে থাক, আমি চালিয়ে নেব। তুমি এবার ফিরে যাও, দেরি হলে তোমার বাবা ভাববেন।'

সেবন্তী বলল,—'তুমি তাহলে রাত্তিরে এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

সেবন্তী মন্দিরের সামনে একটা কুঁড়ে ঘর দেখিয়ে বলল,—'তুমি ওই ঘরে শুয়ো। ওটা আমাদের ঘর।'

'আচ্ছা।'

সেবন্তী উঠল। মন্দিরের দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলল,—'আমি তবে যাই?'

'এস বহিন।'

সেবন্তী চলে গেল, চাঁদের আলোয় যেন মিলিয়ে গেল। সদাশিব আরও কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া দরকার। ভোরেই আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। এখনও দু'দিনের রাস্তা বাকি।

* * * *

সেবন্তীর ঘরে দোর বন্ধ করে সদাশিব ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখনও চাঁদ অস্ত যায়নি, দরজায় খুট্‌খুট্ শব্দ শুনে সে জেগে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে শোনবার পর সে সতর্কভাবে বলল,—'কে?'

বাইরে থেকে মিহি গলায় উত্তর এল,—'আমি সেবন্তী। দোর খোলো।'

সদাশিব দোর খুলে দেখল সেবন্তী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটি পুঁটুলি। সে আশ্চর্য হয়ে বলল,—'তুমি আবার এলে যে?'

সেবন্তী পুঁটুলি দেখিয়ে বলল,—'তোমার জন্য খাবার এনেছি। কৈ, তোমার থলি বার কর।'

সদাশিব আরও আশ্চর্য হয়ে থলি বার করে দিল, বলল,—'খাবার কোথায় পেলে?'

সেবন্তী পুঁটুলি থেকে সব খাবার সদাশিবের থলিতে ভরে দিতে দিতে বলল,—'সে খবরে তোমার দরকার কি? এতে তোমার দু'দিন চলে যাবে।'

সদাশিব গাঢ়স্বরে বলল,—'তোমাকে যতই দেখছি কুঙ্কুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কত পয়সা দেব, সেবন্তি বহিন?'

সেবন্তী বলল,—'পয়সা চাই না। তুমি আবার এই রাস্তা দিয়ে ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে নগর থেকে কিছু-মিছু কিনে এনো। আমি রোজ সকাল সন্ধ্যে এইখানে বসে তোমার পথ চেয়ে থাকব।'

'আচ্ছা। যদি ফিরি নিশ্চয়ই আনব।'

'তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও। সকাল হতে এখনো অনেক দেরি। আচ্ছা!'

'আচ্ছা!'

সেবন্তী কিছুদূর চলে যাবার পর সদাশিব ডাকল, 'সেবন্তি বহিন।'

সেবন্তী ফিরে এসে কাছে দাঁড়াল—'কী?'

সদাশিব বলল,—'গ্রামবাসিদের বলো তারা এখন গ্রামে ফিরে আসতে পারে। আর কোনও ভয় নেই।'

সেবন্তী বলল,—'কিন্তু—বিজাপুরী সিপাহীর দল যে এই পথ দিয়ে ফিরে আসবে।'

সদাশিব বলল,—'না, তারা আর ফিরে আসবে না।'

॥ চার ॥

পরদিন কাক কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সদাশিব যাত্রা শুরু করল। সারাদিন পথ চলল। দুপুর বেলা সেবন্তীর দেওয়া খাবার খেল। কয়েক মুঠি শুকনো ছোলা, কয়েকটা জনারের রুটি আর

এক ডেলা আকের গুড়। যাদের সর্বস্ব সিপাহীরা লুটে নিয়ে গেছে তারা এর বেশি আর কী দিতে পারে? সেবন্তি বহিন যেন কুঙ্কুর যমজ বোন, নিশ্চয় নিজের খাবার তাকে দিয়েছে। সব মেয়েই কি এক রকম হয়?

সারাদিন চলেও সে খোঁড়া ঘোড়ার দেখা পেল না। কোথায় গেল ঘোড়া আর তার সওয়ার? তবে কি তারা পিছিয়ে গেছে? হয়তো খোঁড়া ঘোড়া আর চলতে পারেনি, তাই সওয়ার পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে এগিয়ে গিয়ে থাকে! সদাশিব শাহজিকে খবর দেবার আগেই যদি বিজাপুর দরবারে খবর পোঁছে যায় তাহলেই সর্বনাশ! সদাশিবের এতদূর আসাই মিথ্যে হয়ে যাবে। শাহজিকে সুলতান হয়তো কোতল করবে।

সদাশিব যথাসাধ্য জোরে ঘোড়া চালাল, কিন্তু খোঁড়া ঘোড়ার নাগাল পেল না। সন্ধ্যাবেলায় সে এমন এক জায়গায় এসে পোঁছল যেখানে কোনো লোকালয় নেই। কি করা যায়? সে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে সিন্ধুঘোটককে একটা গাছের তলায় ছেড়ে দিল, আর নিজে গাছে উঠে বসল। গাছটি বেশ বড় আর ঝাঁকড়া। সদাশিবের গাছে ঘুমানো অভ্যেস আছে; সে একটা মোটা ডালের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসল, গুঁড়িটি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে তার গায়ে গাল রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাছের নীচে আশেপাশে ঘাস গজিয়েছে, সিন্ধুঘোটক চাঁদের আলোয় তাই খেতে লাগল। তারপর পেট ভরলে গাছের তলায় বসে সেও ঘুমোতে লাগল।

পরদিন সদাশিব আবার চলল। আজ কিন্তু রাস্তার চেহারা অন্য রকম। মাঝে মাঝে রাস্তায় দু'চারটে লোক দেখা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে গ্রামের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রামেই মুসলমানের বাস। সদাশিব বুঝল বিজাপুর নগর আর বেশি দূর নয়।

দুপুর বেলা সদাশিব সিন্ধুঘোটককে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেও খেতে বসল। বসে বসে খাচ্ছে আর ভাবছে, এমন সময় দেখল পিছন দিক থেকে এক পাল ভেড়া নিয়ে, একটা লোক আসছে। বোধহয় কাছের কোনো গ্রাম থেকে আসছে, কারণ সদাশিব আগে তাদের রাস্তায় দেখতে পায়নি। লোকটা

ভেড়ার পাল নিয়ে পীরবক্স কশাই বিজাপুরে যাচ্ছে—দূরে সিন্ধুঘোটকারোহী সদাশিব

ভারি জোয়ান একজন মুসলমান, এড়ো বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে। ভেড়াগুলো তার আগে আগে যাচ্ছে।

সদাশিবের সামনা সামনি এসে লোকটা বাঁশী থামাল, এক গাল হেসে বলল,—'কি স্যাঙাৎ, এখানে বসে কি হচ্ছে?'

সদাশিব দেখল লোকটা বেশ ফুর্তিবাজ। সেও হেসে বলল,—'খাচ্ছি। খেয়েই আবার রওনা দিতে হবে। বিজাপুর আর কতদূর বলতে পার?'

লোকটা বলল,—'তুমি বিজাপুর যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা সিন্ধুঘোটকের দিকে তাকাল, তারপর বলল,—'তোমার ঘোড়া আছে দেখছি। তবু আজ বিজাপুরে পৌঁছতে পারবে না,

আজ রাত্তিরটা পথেই কাটাতে হবে। কাল বেলা দু'ঘড়ি আন্দাজ সহরে পৌঁছবে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'লোকটা হো হো করে হেসে বলল,—'আমিও বিজাপুর যাচ্ছি। আমি পৌঁছব পরশু।'

'এত ভেড়া নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'ভেড়া কাটব, বিক্রি করব। আমি কশাই।' লোকটা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে খাওয়া শেষ করে সদাশিব সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে রওনা হল। কিছুদূর এগিয়ে ভেড়ার পাল আর কশাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা। কশাই বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে, হেসে বলল,—'বিজাপুরে আবার দেখা হবে। ভাল মাংস চাও তো আমার দোকানে এস। পীরবক্স কশাইয়ের নাম সবাই জানে। এমন মাংস আর কোথাও পাবে না।' হো হো করে হেসে সে আবার বাঁশী বাজাতে লাগল।

সদাশিব এগিয়ে চলল। ভাবল, ভারি মজাদার কশাই তো! অবশ্য পীরবক্স কশাইয়ের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সদাশিব এক নদীর ধারে পৌঁছল। নদী খুব চওড়া নয়, গভীরও নয়, তবে নৌকা চলে। ওপারে একটা খড়-বোঝাই নৌকা বাঁধা রয়েছে। নদীর ধারের এক গাদা খড় ডাঁই করা রয়েছে।

সদাশিব নদী পার হল। নদীর জল সিন্ধুঘোটকের পেট পর্যন্ত পৌঁছল। ওপারে গিয়ে সদাশিব দেখল নৌকায় মাঝিমাল্লা কেউ নেই। হয়তো কাছেই গ্রাম আছে।

সদাশিব একটু ভাবল। গ্রাম কোথায় খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না, তার চেয়ে নদীর ধারে এই খড়ের গাদার মধ্যে রাত কাটালে মন্দ হয় না। সকাল না হলে মাঝিমাল্লা আসবে না, তার আগেই সে বেরিয়ে পড়বে।

সিন্ধুঘোটককে নদীর ধারে ছেড়ে দিয়ে সদাশিব রাত্রির খাবার খেয়ে নিল, তারপর খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে শুয়ে রইল। খড়ের মধ্যে বেশ গরম, সদাশিবের শরীরও ক'দিন অনবরত ঘোড়া চালিয়ে ক্লান্ত হয়েছিল, সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

একেবারে ঘুম ভাঙল যখন পুবের আকাশে উষার আলো ঝিলমিল করছে। সদাশিব খড়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, নদীর জলের ওপর শাদা মল্‌মলের মত কুয়াশা জমেছে। ঘোড়াটা খানিক দূরে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব তাড়াতাড়ি সেইদিকে চলল। বড্ড দেরী হয়ে গেছে! কিন্তু ঘোড়ার কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! এ কি! এ তো সিন্ধুঘোটক নয়! এ যে—এ যে সেই খোঁড়া ঘোড়াটা! ঐ যে হাঁটুতে ফেট্টা বাঁধা রয়েছে।

সদাশিব মাথায় হাত দিয়ে বসল। ব্যাপার বুঝতে তার দেরী হল না। খোঁড়া ঘোড়ার সওয়ার কখন এক সময় পেছিয়ে গিয়েছিল, তারপর সারা রাস্তা তার পিছন পিছন আসছিল। আজ রাত্তিরে কোনও সময় সে নদী পার হয়ে সিন্ধুঘোটককে চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছে, তারপর নিজের খোঁড়া ঘোড়াটা এখানে রেখে সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে পালিয়েছে।

এখন উপায়! সদাশিবের কান্না এল। এই খোঁড়া ঘোড়াটার পিঠে চড়েই বিজাপুর যেতে হবে। হয়তো পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সুলতানের কানে খবর উঠবে—

কিন্তু উপায় কি? সদাশিব খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে কম্বল বাঁধল, মুখে লাগাম লাগালো, তারপর ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বিজাপুরের দিকে চলল।

## ।। পাঁচ ।।

ঢেউ খেলানো রাস্তা।

বেলা দু'ঘড়ির সময় একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে সদাশিব দেখল, দূরে আকাশের গায়ে বিজাপুর শহরের দুর্গপ্রাকার যেন আঁকা রয়েছে।

সেখানে পৌঁছতে কিন্তু দুপুর পার হয়ে গেল।

বিজাপুর নগরের দুর্গপ্রাকারের নীচে দাঁড়িয়ে তার মাথার দিকে তাকালে ঘাড় খচে যায়, এত উঁচু। তোরণের প্রবেশপথও উঁচু, কিন্তু বেশি চওড়া নয়। সদাশিব যখন পৌঁছল দুর্গদ্বারে বেশি ভিড় নেই। প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, দু'চারজন মুসাফির শহরে ঢুকছে,

দু'চারজন বেরুচ্ছে। বাইরে উটের দল বসে আছে, একপাল গাধা পিঠে মালের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে প্রাকারের গায়ে বড় বড় লোহার আংটা ঝুলছে, তাতে পাশাপাশি কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

সদাশিব কোনও দিকে না তাকিয়ে একেবারে ঘোড়াসুদ্ধ তোরণ-দ্বারের সামনে হাজির হল। অমনি দু'জন প্রহরী বল্লম নিয়ে তার পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। একজন বলল,—'ঘোড়া নিয়ে এ ফটক দিয়ে ঢোকবার হুকুম নেই। কে তুমি ?'

সদাশিব বলল,—'আমি পুণা থেকে জরুরী কাজে এসেছি।'

প্রহরী বলল,—'আগে ঘোড়া বেঁধে রেখে এস, তারপর তোমার কথা শুনব।'

সদাশিব ঘোড়া বাঁধার জায়গায় গেল। সেখানে ছ'সাতটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে ; সদাশিব ঘোড়া থেকে নেমে অন্য ঘোড়াদের পাশে নিজের ঘোড়া বাঁধতে যাবে, একটা ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দে চমকে উঠল। চোখ ফিরিয়ে দেখল—আরে এ কি ! সিন্ধু-ঘোটক। যে লোকটা সিন্ধুঘোটককে চুরি করেছিল সে এইখানে তাকে বেঁধে রেখে নগরে প্রবেশ করেছে।

সদাশিবের বুক নেচে উঠল। কিন্তু এখন সময় নেই। সে সিন্ধু-ঘোটকের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে ফটকের কাছে ফিরে গেল।

প্রধান প্রহরী জিজ্ঞাসা করল,—'নগরে কার সঙ্গে তোমার জরুরী কাজ ?'

সদাশিব বলল,—'আমার মামা বলবন্ত রাও মন্সবদার শাহজি ভোঁসলের অধীনে কাজ করে। আমি মামাকে জরুরী খবর দিতে এসেছি।'

প্রহরী বলল,—'কিন্তু মন্সবদার শাহজি ভোঁসলে তো এখানে নেই। তিনি নিজের দলবল নিয়ে সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ'র সঙ্গে জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করতে গিয়েছেন।'

'অ্যাঁ ! এখানে নেই ?'

'না।'

'জিঞ্জি দুর্গ কোথায় ? কতদূর ?'

প্রহরী ডান দিকের রাস্তা দেখিয়ে বলল,—'জিঞ্জি দুর্গ এইদিকে। চার পাঁচ দিনের পথ।'

সদাশিব একটু ভাবল। এ মন্দ হল না। সুলতান খবর পেলেও শাহজি তাঁর নাগালের বাইরে। এখনও সময় আছে।

সে বলল,—'আমাকে যেতেই হবে। মামাকে খবর না দিলেই নয়। আচ্ছা, সেলাম।'

'সেলাম।'

সদাশিব সতর্কভাবে লক্ষ্য রেখে সিন্ধুঘোটকের কাছে ফিরে গেল

সদাশিব ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে না। সে তখন সিন্ধুঘোটককে খুলে নিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল, যে রাস্তা প্রহরী দেখিয়ে দিয়েছিল সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

॥ ছয় ॥

সদাশিব চলেছে তো চলেছেই। দিন যায়, রাত আসে; আবার দিন আসে। পূর্ণিমা কেটে গিয়ে কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। কিন্তু জিঞ্জির পথ আর শেষ হয় না। কোথায় জিঞ্জি? কত দূরে?

এদিকে রাস্তার ধারে ধারে যে-সব গ্রাম আছে তাদের অবস্থা ভাল। এদিকে তো আর লুটপাট হয়নি। গ্রামবাসিরা

সদাশিবকে খেতে দেয়, রাত্রে শোবার জায়গা দেয়। সদাশিব প্রশ্ন করে,—'জিঞ্জি এখান থেকে কত দূর ?'

তারা হাঁ করে থাকে, বলে,—'জিঞ্জি আবার কি ?'

সদাশিব ঘুরিয়ে বলে,—'বিজাপুরী পল্টন কোন্ দিকে গেছে ?'

তারা আঙুল দেখিয়ে বলে,—'ওই দিকে।'

সদাশিব সেই দিকে ঘোড়া চালায়।

রাস্তা আগের মতই আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু ; মাঝে মাঝে নদী আছে। রাস্তায় যারা যাতায়াত করে তারা কেউ দূরের যাত্রী নয়, বেশির ভাগই এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যায়। কদাচিৎ দু'একদল সওদাগরের উট গলা উঁচু করে চলে যায় ; দু'চারটে গরুর গাড়ি মালের বোঝা নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে চলতে থাকে।

একদিন বিকেলবেলা সদাশিব চলেছে, শুনতে পেল পিছনে খট্‌খট্‌ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দু'জন সওয়ার আসছে। তাদের সাজপোষাক তলোয়ার বল্লম দেখে সদাশিব বুঝল এরা বিজাপুরী সৈনিক। সে তাড়াতাড়ি রাস্তার এক পাশে সরে গেল।

বিজাপুরী সওয়ারদের তেজী ঘোড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই সদাশিবের পাশাপাশি হল। সদাশিবের ঘোড়া দেখে বিজাপুরী ঘোড়া দুটো অবজ্ঞাভরে নাক ঝাড়া দিল। সওয়ার দু'জনও সিন্ধুঘোটকের পানে তাকাতে তাকাতে চলল। তারা নিজের ঘোড়ার বেগ কমিয়ে সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

সদাশিব লক্ষ্য করল সওয়ার দু'জন সামান্য সিপাহী শ্রেণীর লোক নয়, তাদের দর্জা আরও উঁচু। বোধহয় হাবিলদার কি জুমলাদার। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ হেসে উঠে বলল,—'শোভান মিঞা, এমন জালার মত পেটওয়ালা ঘোড়া কখনও দেখেছ ?'

শোভান মিঞা হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল, তারপর তার চোখ ঘোড়া ছেড়ে আরোহীর দিকে উঠল। সে দেখল, একটা ছোট ছেলে, এখনো গোঁফ ওঠেনি। সে বলল,—'কি রে ছোঁড়া, তোর ঘোড়া কি খায় ?'

সদাশিব বলল,—'ঘাস খায়।'

দু'জনে হো হো করে হেসে উঠল। যেন ভারি হাসির কথা। অন্য মিঞা জিজ্ঞাসা করল,—'শুধু ঘাস খায়? দানা খায় না?'

সদাশিব বলল,—'না।'

শোভান মিঞা বলল,—'তবে বোধহয় হাওয়া খায়। হাওয়া খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে গেছে। উড়তে পারে?'

সদাশিব মাথা নেড়ে বলল,—'উঁহু।'

শোভান মিঞা বলল,—'তবে পক্ষীরাজ নয়। পক্ষীরাজ হলে উড়ত। কি বলো হায়দর মিঞা?'

এইভাবে হাসি-মস্করা করতে করতে দুই মিঞা সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কিছুদূর চলবার পর হায়দর মিঞা সদাশিবকে জিজ্ঞাসা করল,—'তোর নাম কি রে? কোথায় যাবি?'

'আমার নাম সদাশিব। আমি জিঞ্জি যাব।'

'তুইও জিঞ্জি যাবি! জিঞ্জিতে তোর কী দরকার?'

'মামার সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

দু'জনেই বেশ আশ্চর্য হয়েছে মনে হল। হায়দর মিঞা সন্দেহভরা চোখে তার পানে তাকিয়ে বলল,—'তোর বাড়ি কোথায়? কোথা থেকে আসছিস?'

'পুণা থেকে।'

'পুণা থেকে!'

হায়দর মিঞা আর শোভান মিঞা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর হায়দর মিঞা কড়া সুরে বলল,—'তুই জিঞ্জিতে কার কাছে কি জন্যে যাচ্ছিস সব কথা খুলে বল। নৈলে কেটে ফেলব।'

সদাশিব কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,—'আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম—'

'বল। সত্যি কথা বলবি।'

সদাশিব তখন শিবাজীর শেখানো গল্প বলল,—'আমার মামা বলবন্ত রাও নাইক বিজাপুরের মনসবদার শাহজির সৈন্যদলের একজন হাবিলদার। পুণায় মামার ঘরবাড়ি জমি-জিরাত আছে, মালদার লোক। মামা পুণায় থাকে না, শাহজির ফৌজের সঙ্গে বিজাপুরে থাকে; আর মামী ছেলেপুলে নিয়ে পুণায় থাকে।

আমিও মামার বাড়িতে থাকি। এক মাস আগে শিবাজীর দলের ডাকাতেরা মামার ঘরবাড়ি লুটে নিয়ে গেছে। তাই আমি মামাকে খবর দিতে বেরিয়েছিলাম। বিজাপুরে গিয়ে শুনলাম মামা শাহজির সঙ্গে জিঞ্জি গিয়েছে। তাই আমিও জিঞ্জি যাচ্ছি।'

ছুই মিঞা আবার মুখ তাকাতাকি করল। শোভান মিঞা বলল,—'শাহজি ভোঁসলে শিবাজীর বাপ তুই জানিস?'

সদাশিব বলল,—'জানি। বাপ-বেটায় মুখ দেখাদেখি নেই।'

'হুঁ।' ছুই মিঞা কিছুক্ষণ খাটো গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলল, তারপর শোভান মিঞা সদাশিবকে বলল,—'আমরাও জিঞ্জি যাচ্ছি, তুই আমাদের সঙ্গে আয়।'

সদাশিব উল্লসিত হয়ে বলল,—'তোমরাও জিঞ্জি যাচ্ছ? তবে তো ভালই হল। একলা যেতে বড় ভয় করে। তোমরা বুঝি বিজাপুরের ফৌজদার?'

'হ্যাঁ।—আয় আমাদের পিছন পিছন।'

'আচ্ছা। কতদিন আর লাগবে জিঞ্জি পৌঁছতে?'

'কাল সন্ধ্যে লাগাদ পৌঁছনো যাবে।'

ছু'জনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সদাশিব ওদের পিছনে চলল।

কিন্তু সদাশিবের প্রাণে শান্তি নেই। এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। ওরা যদি মিথ্যে কথা ধরে ফেলে তবেই সর্বনাশ। ওরা নিশ্চয় বিজাপুর দরবারের দূত, জিঞ্জিতে যাচ্ছে শাহজিকে বন্দী করতে। এখন উপায়? যেমন করে হোক, ওদের আগে শাহজিকে সাবধান করে দিতে হবে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই এমন সময় সদাশিব এক গ্রামে এসে উপস্থিত হল। মিঞারা আগেই এসেছে। গ্রামের বেশির ভাগ লোক মুসলমান, ছু'চার ঘর হিন্দু আছে। সদাশিব দেখল মিঞাদের ঘোড়া ছুটিকে ছু'জন ষণ্ডা লোক ডলাই-মলাই করছে। মিঞা ছু'জন খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে বসেছে, ফরসিতে তামাকু খাচ্ছে। গ্রামবাসীরা অনেকে খাটিয়া ঘিরে উপু হয়ে বসেছে। হাসি গল্প হচ্ছে।

সদাশিবকে দেখে শোভান মিঞা বলল,—'আরে, তুই এসেছিস! আমি ভেবেছিলাম তোর ঘোড়াটা রাস্তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল, যেন মিঞার রসিকতা বুঝতেই পারেনি এমনি সরলভাবে বলল,—'ঘুমোয়নি। বড্ড থকে আছে কিনা তাই বেশি জোরে ছুটতে পারে না।—আমি কি আজ এই গ্রামেই থাকতে পাব?'

হায়দর মিঞা বলল,—'হ্যাঁ পাবি। আমরাও থাকব। তুইও থাকবি। কাল সকালে এক সঙ্গে বেরুব।'

সদাশিব মিঞাদের মতলব বুঝল; তারা তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে। কিন্তু সদাশিবের মতলব অন্য রকম; ওদের আগে তাকে জিঞ্জি পৌঁছতে হবে। ওরা যদি শাহজির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে জিঞ্জি যাত্রা করে থাকে, তাহলে যেমন করে হোক ওদের আগে শাহজির ছাউনিতে পৌঁছনো দরকার।

সে রাত্রে সদাশিব একজন হিন্দু গ্রামবাসীর ঘরে খাওয়া দাওয়া করে তার দাওয়ায় শুয়ে রইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে ঘুমের ঘোরে শুনতে পেল মিঞারা খানাপিনা হৈ-হুল্লোড় করছে।

## ॥ সাত ॥

শেষ রাত্রে তার ঘুম ভাঙল। কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ আকাশের মাঝখানে, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝিমঝিম করছে। গ্রাম নিশুতি। সদাশিব আস্তে আস্তে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল সিন্ধুঘোটক রাস্তার এক পাশে বসে আছে। সদাশিবকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

সদাশিব সিন্ধুঘোটকের মুখে লাগাম লাগালো, পিঠে কম্বল বাঁধল, তারপর যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ল; গ্রাম থেকে কিছু দূরে গিয়ে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সকাল হতে এখনও দু'তিন ঘড়ি দেরি আছে, সদাশিব এর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

সকাল হল; তারপর সূর্য মাথায় উঠল। সদাশিব চলেছেই। মাঝে দু'একটা গ্রাম পড়ল, সদাশিব থামল না। এদিকে সে যতই এগিয়ে চলেছে ততই চারিদিকে পাহাড় ঘিরে ঘুরে আসছে। দাক্ষিণাত্য পার্বত্য দেশ, কিন্তু মাঝে মাঝে সমতল উপত্যকা আছে।

এখন আবার পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে পাথুরে পথ পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

সদাশিব সামনের দিকে চলেছে বটে কিন্তু তার কান পড়ে আছে পিছন দিকে। ঐ বুঝি ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌খট্‌ আওয়াজ শোনা যাবে। কিন্তু দুপুর কেটে গেল, মিঞাদের দেখা নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করে তাদের বোধহয় ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে।

বিকেলের দিকে পাহাড়ের খাঁজে এক জায়গায় কচি ঘাস দেখে সদাশিব সিন্ধুঘোটককে সেখানে ছেড়ে দিল, নিজেও কিছু খেয়ে নিল। থলিতে সে মাঝে মাঝে যে খাবার সংগ্রহ করেছে তা প্রায় শেষ হয়ে এল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সে আবার চলল। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মেঘ ঘোরাফেরা করছে, হয়তো হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। তার আগে জিঞ্জি পৌঁছতে পারলেই ভাল। জিঞ্জি আর বেশি দূর নয়।

পাহাড়ী জায়গায় কখন সূর্যাস্ত হয় বোঝা যায় না। সদাশিব দেখল, সূর্য দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘের গায়ে সোনালী রোদ লেগে আছে। সূর্যাস্ত হতে বেশি দেরি নেই। সদাশিব আরও জোরে ঘোড়া চালাল। কৈ, জিঞ্জি আর কত দূর?

এদিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে; মাটি ভিজে ভিজে, গাছের পাতায় জল লেগে আছে। সামনে নিচের দিকে গভীর একটা খাত দেখা যাচ্ছে, তার কিনারায় ছোট্ট একটি গ্রাম। সিন্ধুঘোটক সামনে ঢালু রাস্তা পেয়ে জোরে চলতে আরম্ভ করেছে এমন সময় পিছনে শব্দ শুনে সদাশিব চমকে উঠল।

ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌খট্‌ শব্দ। সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হ্যাঁ, দুই মিঞা আসছে!

সদাশিব গাঁয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতে তারা এসে সদাশিবকে ধরে ফেলল; তিনটে ঘোড়া মুখোমুখি দাঁড়ালো। হায়দর মিঞা চোখ পাকিয়ে বলল,—'তুই আমাদের ফেলে পালিয়ে এসেছিস যে!'

সদাশিব অবাক হয়ে বলল,—'পালিয়ে আসব কেন?

তোমাদের সঙ্গে বেরুলে পেছিয়ে পড়তাম তাই আগে বেরিয়েছি। এখন একসঙ্গে যাব।'

'হুঁ।' মিঞারা দেখল সদাশিব ন্যায্য কথাই বলেছে। তারা আর কিছু বলল না।

ইতিমধ্যে তিনজন সওয়ারকে রাস্তায় দেখে গাঁয়ের কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, শোভান মিঞা তাদের জিজ্ঞাসা করল,—'জিঞ্জি আর কত দূর?'

একজন সামনে আঙুল দেখিয়ে বলল,—'ঐ যে পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে ওর ওপারে জিঞ্জি দুর্গ। এখান থেকে তিন চার কোশ।'

শোভান মিঞা বলল,—'এস, রাত্রি হবার আগেই জিঞ্জি পৌঁছনো যাবে।' বলে ঘোড়ার রাশ আল্‌গা করল।

গ্রামবাসী বলল,—'আজ পৌঁছতে পারবেন না।'

শোভান মিঞা ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়াল, বলল,—'কেন? আজ পৌঁছতে পারব না কেন?'

গ্রামবাসী বলল,—'আজ্ঞে নদী ফুলেছে।'

'নদী ফুলেছে! তার মানে?'

'আজ্ঞে নদীতে ঢল্ নেমেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল কিনা।'

'তাই না কি? চল তো দেখি।'

সকলে এগিয়ে চলল। গ্রাম পার হতে না হতেই কানে এল কল্‌কল্ শব্দ। সামনে নদীর খাত। বেশি চওড়া নয়, বড় জোর চল্লিশ গজ। তার কানায় কানায় জল ভরে উঠেছে, ঘোলা জল পাগলের মত ছুটে চলেছে। জিঞ্জি যাবার রাস্তাটা খাতের কিনারা পর্যন্ত এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে, আবার খাতের ওপারে আরম্ভ হয়েছে। মাঝখানে দুরন্ত নদী।

তিন ঘোড়সওয়ার খাতের ধারে গিয়ে দাঁড়াল; গ্রামবাসীরাও তাদের দু'পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। হায়দর মিঞা কিছুক্ষণ ছুটন্ত জলের পানে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল,—'জল কত?'

একজন বলল,—'তিন মানুষ।'

শোভান মিঞা আর হায়দর মিঞা মুখ তাকাতাকি করল,—'তাহলে?'

'এ নদী পার হওয়া যাবে না। যতদিন না জল কমে ততদিন এখানেই থাকতে হবে।'

‘কতদিনে জল কমবে ঠিক কি ?’ .

গ্রামবাসীরা বলল,—‘জনাব, আর যদি পাহাড়ে বৃষ্টি না হয়, রাতারাতি জল কমে যাবে। কাল সকালে দেখবেন আবার হাঁটু-জল।’

‘তাহলে আজ রাত্তিরটা গ্রামেই থাকা যাক।’

সদাশিবের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। এই সুযোগ। শিবাজী বলেছিলেন সিন্ধুঘোটক তিন মণ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কৃষ্ণা-গোদাবরী পার হতে পারে। মিঞারা পড়ে থাকুক, সে আজই নদী পার হয়ে জিঞ্জি পৌঁছবে।

সদাশিব বলল,—‘আমাকে আজই যেতে হবে। না গেলে মামা মারবে।’

শোভান মিঞা বলল,—‘বলিস কিরে ছোঁড়া! এই নদী পার হবি কি করে?’

সদাশিবকে পিঠে করে সিন্ধুঘোটক নদীতে সাঁতার দিচ্ছে

‘পার হতে না পারি ডুবে মরব’—এই বলে সদাশিব ঘোড়াসুদ্ধ নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল।

মিঞারা হতভম্ব। গ্রামের লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল গেল! গেল! এবার ছোঁড়া ডুবে ম’ল!

সিন্ধুঘোটকের কিন্তু ডোবার নামটি নেই, সে অম্লানবদনে সাঁতার কেটে চলেছে; তার জালার মত পেট তাকে ভাসিয়ে রেখেছে। অবশ্য সব ঘোড়াই অল্পবিস্তর সাঁতার কাটতে পারে।

কিন্তু এই স্রোতে ঐরাবতও ভেসে যায়, ঘোড়া তো দূরের কথা। সিন্ধুঘোটকও সোজাসুজি নদী পার হতে পারল না, তেরছাভাবে খানিক দূর ভেসে গেল, তারপর হাঁচোড় পাঁচোড় করে ওপরে উঠল।

সদাশিব মনে মনে বলল,—'জয় ভবানী।'

মিঞারা জুল্ জুল্ করে চেয়ে রইল! সিন্ধুঘোটকের পেট নিয়ে তারা কত ঠাট্টা তামাশা করেছে, সেই সিন্ধুঘোটকের যে এত কেরামতি তা কে জানত! সিন্ধুঘোটকের কাছে তাদের তেজী আরবী ঘোড়ার মাথা হেঁট হয়ে গেল। ধন্য সিন্ধুঘোটক।

সিন্ধুঘোটক একবার গা-ঝাড়া দিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলল।

মিঞাদের সামনা সামনি এসে সদাশিব ওপর থেকে হাঁক দিয়ে বলল,—'আমি চললাম। আদাব মিঞাসাহেব।' এই বলে সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

॥ আট ॥

পাহাড়ের মাথার ওপর মুকুটের মত জিঞ্জি দুর্গ। দুর্গ তো নয়, যেন মেঘের বুকে অমরাবতী। তাকে ঘিরে আছে স্তরে স্তরে সাতটি প্রাকার। সব চেয়ে নিচে যে প্রাকার তার বেড় দুই ক্রোশ। তার ভিতরে আবার প্রাকার, তার ভিতর আবার। এমনি সাতটি প্রাকার ডিঙিয়ে তবে দুর্গের মণিকোঠায় পৌঁছনো যায়।

বিজাপুরের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে জিঞ্জি দুর্গ ঘিরে বসেছেন; কিন্তু ছয় মাসেও দুর্গের প্রথম প্রাকার ভেদ করতে পারেননি। তিনি প্রাকারের বাইরে থানা দিয়ে বসে আছেন; তাঁর অধীনস্থ মন্সবদারেরাও তাঁদের সৈন্য সিপাহী নিয়ে বসে আছেন। শাহজি এই সব মন্সবদারের একজন। সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, সিপাহীরাও সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু দুর্গ জয়ের কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

ভোরের আলোয় প্রাকারের বাইরে বিজাপুরী সৈন্যদের ছাউনি দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের কোলে মেঘ লেগে আছে; শিবিরের পর শিবির। কিন্তু শিবির চক্র নিস্তব্ধ, এখনও সৈন্যদল জেগে ওঠেনি।

শাহজির তাঁবু নিজের সৈন্যদলের মাঝখানে। তিনি সেদিন

সকালে নিজের তাঁবুতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। শাহজি একদিকে যেমন খুব বীর ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শৌখিন বিলাসী ছিলেন। নাচগানের প্রতি তাঁর ভারি অনুরাগ ছিল। কাল অনেক রাত পর্যন্ত নাচ গান আমোদ প্রমোদে কাটিয়ে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। ভোর হতে না হতেই তাঁবুর বাইরে কথা কাটাকাটির আওয়াজ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

বিরক্তভাবে বিছানায় উঠে বসে তিনি শুনতে পেলেন তাঁবুর দ্বাররক্ষী কাকে যেন বলছে,—'তুই কে রে, সাত-সকালে মন্সবদারের দেখা চাস! এখন দেখা হবে না, মন্সবদার ঘুমোচ্ছেন। যা, দু'ঘড়ি পরে আসিস।'

একটি তরুণ মারাঠী কণ্ঠ মিনতি করে বলছে,—'বড় জরুরী কাজ, দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মন্সবদারের ছেলে শিবাজী ভোঁস্‌লে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

দ্বাররক্ষী বলছে,—'শিবাজীর কাছ থেকে আসছিস তার নিশান আছে?'

'আছে, কিন্তু সে তুমি চিনতে পারবে না। তুমি একবারটি মন্সবদারের কাছে এত্তালা দাও—'

এই সময় শাহজি ভিতর থেকে হাঁক দিলেন,—'ওরে, কে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়।'

তখন দ্বাররক্ষী সদাশিবকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে গেল। শিবিরের দেয়াল মখমল দিয়ে মোড়া, ছাদ কিংখাবের, মেঝেয় পুরু পারসী গালিচা। শাহজি খাটের ওপর মল্‌মলের চাদর-ঢাকা বিছানায় বসে আছেন; চোখ দুটি লাল, মুখে বিরক্তির ভাব। অসময়ে কে তার ঘুম ভাঙাল?

সদাশিবকে দেখে তিনি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন,—'কে তুই? কোথা থেকে এসেছিস?'

সদাশিব বলল,—'আমার নাম সদাশিব। শিবাজী আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তোর্ণা দুর্গ থেকে আসছি।'

শাহজি বললেন,—'বটে! নিশান দেখি।'

'এই যে নিশান।' সদাশিব কাছে গিয়ে হাতে বাঁধা তামার কবচ দেখাল—'মা জিজাবাঈ বলেছেন এই তাবিজ দেখলে তুমি চিনতে পারবে।'

শাহজি তাবিজ দেখলেন ; তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। দ্বাররক্ষীকে হাত নেড়ে বিদায় করে তিনি সদাশিবকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন,—'জিজা তোকে পাঠিয়েছে! শিব্বা পাঠিয়েছে! বোস তুই আমার কাছে।'

সদাশিব খাটের কিনারায় বসল। শাহজি ধরা-ধরা গলায় বললেন,—'কেমন আছে রে তারা ? কতদিন যে তাদের দেখিনি !'

সদাশিব বলল,—'সবাই ভাল আছেন। শিবাজী একটা জরুরী খবর দিতে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।'
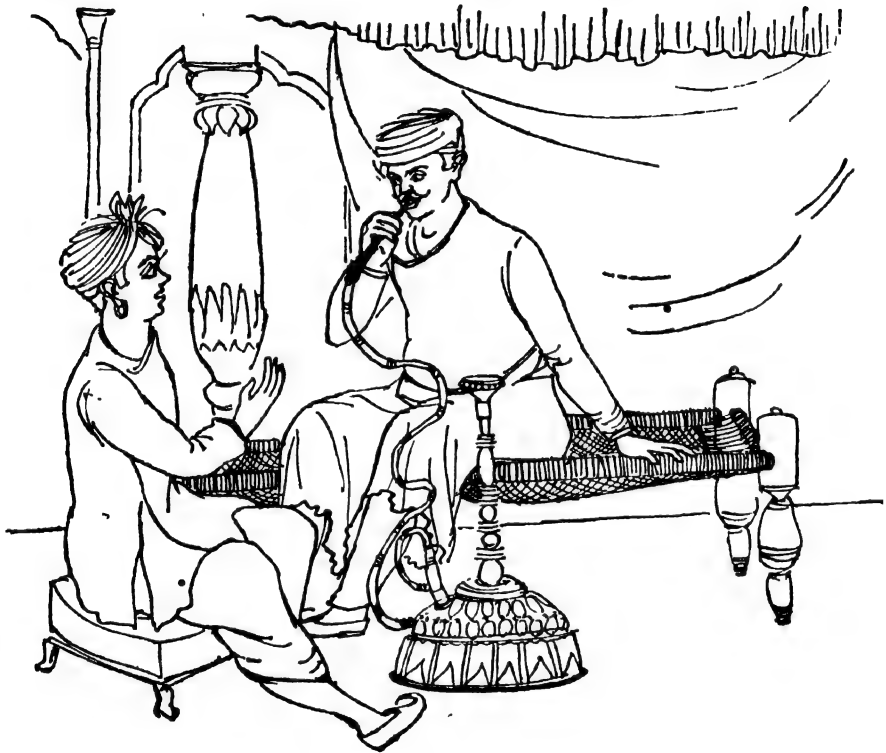
আলাপরত শাহজি ও সদাশিব

'জরুরী খবর ! কী খবর ?'

সদাশিব তখন এক নিশ্বাসে সমস্ত খবর বলল। শাহজি তার মুখের ওপর চোখ রেখে শুনলেন। বলা শেষ হলে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষে তিনি ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন,—'শিব্বা !

জিজা! আমি ওদের কোনো দিন খবর নিইনি। কিন্তু ওরা আমাকে এত ভালবাসে! আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত দূরে খবর পাঠিয়েছে!' এই বলে তিনি সদাশিবের গলা জড়িয়ে ধরে আরও জোরে কাঁদতে লাগলেন।

সদাশিব বলল,—'আর কিন্তু বেশি সময় নেই। সুলতানের পরোয়ানা নিয়ে এখনি লোক এসে পৌঁছবে।'

শাহজি চোখ মুছে বললেন,—'আসুক, আমি পরোয়া করি না। আমার যা হবার হবে, তুই শিব্বার কাছে ফিরে যা। তাকে বলিস, আমার জন্যে যেন সে বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ না করে। মারাঠা দেশে বিজাপুরের যত দুর্গ আছে সব শিব্বা কেড়ে নিক, দেশে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করুক। আমার গোলামি করে জীবন কেটে গেল, শিব্বা যেন কারো গোলাম না হয়।'

সদাশিব বলল,—'কিন্তু সুলতান যদি তোমাকে কোতল করে?'

শাহজি বললেন,—'শাহজি ভোঁসলেকে কোতল করা অত সহজ নয়। এখনো পাঁচ হাজার সিপাহী আমার রুটি খায়। কিন্তু সে যাক। শিব্বাকে বলিস আমার কথা যেন না ভাবে। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবব। তবে শিব্বা যেন আমাকে একেবারে ভুলে না যায়।' শাহজির চোখে আবার জল এসে পড়ল।

আবার কান্নাকাটি শুরু হচ্ছে দেখে সদাশিব উঠে পড়ল, বলল, —'আমি তাহলে এবার যাই। তোমার সব কথা শিব্বা রাওকে বলব।'

শাহজি তার হাত ধরে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইলেন। বললেন,—'কী ছেলে রে তুই! এতটুকু ছেলের এত বুদ্ধি, এত সাহস! একলা এই শত্রুপুরীতে এসেছিস!' তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন,—'সাবাস! এই তো চাই। যার বুদ্ধি আর সাহস আছে সে পৃথিবী জয় করতে পারে। তোরাও পারবি।'

তিনি বালিসের তলা থেকে এক মুঠি মোহর নিয়ে সদাশিবকে দিলেন,—'এই নে তোর রাস্তার খরচ। আর এই নে আংটি; এটা জিজাকে দিস। তার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়, এই আমার শেষ উপহার।'

হীরের আংটি নিজের আঙুল থেকে খুলে শাহজি সদাশিবকে দিলেন; কাঁইবিচির মত হীরেটা ঝক্‌মক করে উঠল।

সদাশিব আংটি আর মোহর কোমরে গুঁজল, তারপর শাহজিকে প্রণাম করে বাইরে এল। শাহজি জল-ভরা চোখে তার পানে চেয়ে রইলেন।

।। নয় ।।

সদাশিব ফিরে চলেছে। তার বুকে কার্যসিদ্ধির আনন্দ, ট্যাঁকে মোহর আর আংটি। সে যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে।

মুস্তাফা খাঁ'র ছাউনি পার হয়ে সে একবার পিছন ফিরে তাকালো। ছাউনির সিপাহীরা জেগে উঠেছে। তাদের মাথার ওপর জিঞ্জি দুর্গের বিরাট আয়তন আকাশ ভেদ করে উঠেছে, সকালবেলার কাঁচা রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করছে।—

জিঞ্জি দুর্গ পিছনে রেখে সদাশিব এগিয়ে চলল। ঘরের দিকে তার মন টানছে, শিবাজীর দিকে মন টানছে। সিন্ধুঘোটকও বোধহয় বুঝতে পেরেছে, সে মোটা পেট নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছে।

সদাশিব ভাবতে ভাবতে চলেছে। শিবাজী রাজাকে দেখবার জন্য তার মন আন্‌চান্ করছে, মা জিজাবাঈয়ের আঙুলে আংটি পরিয়ে দেবার জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে।···কিন্তু তোর্ণা দুর্গে ফিরে যেতে বারো চৌদ্দ দিন লাগবে। সেবন্তি বহিন বলেছিল নগর থেকে কিছুমিছু কিনে আনতে। নগর অর্থাৎ বিজাপুর শহর দেখা হয়নি ; ফেরার পথে বিজাপুরে গেলে কেমন হয় ? সদাশিব কখনও বড় শহর দেখেনি। বিজাপুর নাকি দাক্ষিণাত্যের সেরা শহর। মন্দ কি, শহর দেখাও হবে, সেবন্তীর জন্যে কিছুমিছু কেনাও হবে। সেজন্যে যদি দু'ঘড়ি দেরি হয়, ক্ষতি কি ? আসল কাজ তো হয়ে গেছে।

সেবন্তীর জন্যে কী কিনবে সে ? খুব দামী জিনিষ কিনবে। রাঙা টকটকে চুন্‌রী শাড়ি ; রুপোর বালা, রুপোর হাঁসুলি। সদাশিবের তো আর পয়সার অভাব নেই। ট্যাঁকে করকরে মোহর।

সেবন্তীকে মনে পড়লে কুঙ্কুর কথাও মনে পড়ে। কুঙ্কু গ্রামে আছে, সে জানেও না সদাশিব কোথায়। কুঙ্কুর জন্যে কিছু কিনবে

না? অবশ্য কিনলেও কুঙ্কুকে দেওয়া হবে না, আবার কবে কুঙ্কুর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! তবু কুঙ্কুর জন্য সে কিছু কিনবে, কিনে নিজের কাছে রেখে দেবে। তারপর যখন দেখা হবে—

কুঙ্কুর জন্য কী কিনবে? শাড়ি? উহুঁ। গয়না?···একটা আংটি কিনলে কেমন হয়? সোনার আংটি! শাহজি জিজাবাঈকে যেমন আংটি দিয়েছেন, সেও তেমনি কুঙ্কুকে আংটি দেবে—

সামনে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে সদাশিবের চমক ভাঙল। সে চোখ তুলে দেখল, ঐ রে, শোভান মিঞা আর হায়দর মিঞা আসছে। এতক্ষণে তারা নদী পার হয়েছে।

সদাশিব চট করে বুদ্ধি স্থির করে নিল। সামনা সামনি হতেই মিঞারা রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। হায়দর মিঞা কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বলল,—'কি রে, তুই এখুনি ফিরে যাচ্ছিস যে?'

সদাশিব কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল,—'আমার মামা মরে গেছে। লড়াই করতে করতে মরে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি মামীকে খবর দিতে যাচ্ছি।—নদীর জল কি কমে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাহলে আদাব।'

সদাশিব ঘোড়া চালিয়ে দিল, আর পিছন ফিরে চাইল না। মিঞারা কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর সামনের দিকে ঘোড়া চালাল। সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ'র কাছে সুলতানের পরোয়ানা আগে দাখিল করা দরকার।

## ॥ দশ ॥

যেদিন সদাশিব তোর্ণা দুর্গ থেকে বেরিয়েছিল, ঠিক তার এক মাস পরে সে ফিরে এল। ফেরার পথে অবশ্য উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। কিন্তু সদাশিব বিজাপুর শহর না দেখে ছাড়েনি। কী শহর! চারিদিকে রঙবেরঙের মীনার গম্বুজ, দোতলা তিনতলা বাড়ি; রাস্তায় হাতী ঘোড়া, ওমরাদের তাঞ্জাম। বাজারে ঢুকলে চোখ ঝলসে যায়; কোথাও ফল ফুলের দোকান, কোথাও সারি সারি কাপড়ের পটি, কোথাও হীরা জহরতের মণ্ডী। সদাশিব সেবন্তীর জন্যে লাল চুন্‌রী কিনল, রূপোর বালা রূপোর হাঁসুলি

কিনল। আর কুঙ্কুমের জন্যে চুপিচুপি কিনল একটি সোনার আংটি। আংটি সে লুকিয়ে রেখে দিল, কেউ দেখতে না পায়।

বিজাপুরের এক মুসাফিরখানায় রাত কাটিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। এবার বাড়ির রাস্তা। যেতে যেতে সে লক্ষ্য করল, গ্রামগুলিতে লোক ফিরে এসেছে। বিজাপুরী সৈন্য যে এ পথ দিয়ে ফিরবে না তা সকলে জানতে পেরেছে।

একদিন বিকেলবেলা সদাশিব এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, শুনতে পেল পাশের দিক থেকে মিহি মেয়েলি গলায় কে তাকে ডাকছে—'সদাশিব ভাই!'

সেবন্তী! সেবন্তী রাস্তার ধারের গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রোজ তার প্রতীক্ষা করে, আজ তাকে দেখেই চিৎকার করে ডাকল,—'সদাশিব ভাই, তুমি এত দেরী করলে, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলে না।'

সদাশিব বলল,—'তোমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাব, তা কি হয় সেবন্তী বহিন? যেতে যেতে ভাবছিলাম এইখানেই কোথাও তোমার গ্রামটা আছে কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারছিলাম না। ভাগ্যিস তুমি ডাকলে!'

গ্রামের লোক গ্রামে ফিরে এসেছিল। সেবন্তী সদাশিবকে নিয়ে গ্রামে গেল। সকলে তার আদর যত্ন করল। চুন্‌রী শাড়ি আর গয়না পেয়ে সেবন্তি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

রাত্রে সদাশিব গ্রামেই রইল। পরদিন ভোরে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সিন্ধুঘোটকের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। এবার সিধা তোর্ণা দুর্গ! শিবাজী রাজা! মা জিজাবাঈ!

দু'দিন পরে সদাশিব যখন তোর্ণা দুর্গের সামনে এসে দাঁড়াল তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। তোরণ খুলে শিবাজী বেরিয়ে এলেন, তাঁর পিছনে দুর্গের সমস্ত লোক। সদাশিব লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। শিবাজী তার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—'কাম ফতে?'

সদাশিব বলল,—'ফতে।'

শিবাজী সদাশিবকে বুকে জড়িয়ে নিলো, বললেন,—'সাবাস আজ থেকে তুমি সর্দার সদাশিব।'

সকলে মিলে দুর্গে ফিরে গেলেন। ছাদের ওপর সভা বসল; সকলে চমৎকৃত হয়ে সদাশিবের ভ্রমণ কাহিনী শুনলেন। শাহজি ছেলেকে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন শুনে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। মা জিজাবাঈ-এর চোখে আনন্দের জ্যোতি ফুটল।

সদাশিবকে এবার তোরা ছেড়ে দে—আয় সদাশিব

সদাশিব হীরের আংটি বের করে জিজাবাঈকে দিয়ে বলল,—'এই নাও মা, এই আংটি মন্সবদার তোমার জন্যে পাঠিয়েছেন।'

আংটি হাতে নিয়ে জিজাবাঈ চিনতে পারলেন, তার চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি সদাশিবের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন, চোখ মুছে বললেন,—'সদাশিবকে এবার তোরা ছেড়ে দে। সব তো শুনলি, আর যদি কিছু শুনতে চাস, কাল শুনিস।

এক মাস না খেয়ে খেয়ে ওর মুখ এতটুকু হয়ে গেছে।—আয় সদাশিব।'

জিজাবাঈ সদাশিবের হাত ধরে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেলেন।